আমাদের পৃথিবী

অষ্টম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক :
নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

<u>প্রস্তাবনা</u>

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

অষ্টম শ্রেণির 'পরিবেশ ও ভূগোল' পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকটির নাম 'আমাদের পৃথিবী'। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বইটিতে পরিবেশ আর মানবজীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের নানা অভিমুখ আলোচিত হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯– নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণির 'আমাদের পৃথিবী' বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

তথ্যভার যাতে শিক্ষার্থীকে উদ্বিগ্ন না করে সে বিষয়ে বইটিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ছবি, সারণি, তালিকা ব্যবহার করে ভূগোলের বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানো হয়েছে। আশা করি, রঙে রূপে চিত্তাকর্ষক এই বইটি শিক্ষার্থীমহলে সমাদৃত হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'আমাদের পৃথিবী' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

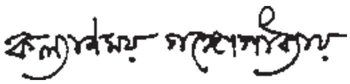

মার্চ, ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক- এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে 'পরিবেশ ও ভূগোল' পর্যায়ভুক্ত বইগুলির মধ্যে অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'আমাদের পৃথিবী' প্রকাশিত হলো। এই পাঠ্যপুস্তকে 'ভূগোল' বিষয়টিকে মানবজীবন আর তার পরিবেশের নিরিখে পরিবেশন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর চেনা গণ্ডি অর্থাৎ তার বাড়ি, স্কুল, চারপাশের জগৎ থেকে ক্রমে ব্যাপ্ততর ভৌগোলিক ধারণার মধ্যে ধাপে ধাপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নানা ধরনের হাতে-কলমে কর্মচর্চার মাধ্যমে যাতে শিক্ষার্থীর কাছে ভূগোলের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। নানান সরল মানচিত্র, বৈচিত্র্যে ভরা ছবি, ধারণা গঠনের লেখচিত্র, তথ্যমৌচাক প্রভৃতি অভিনব শিখন সম্ভারে বইটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে সামগ্রিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের (CCE) নানা ক্ষেত্র বইটিতে বিদ্যমান। সেসব সমীক্ষা আর সক্রিয়তা উত্তেজনা আর আনন্দে ভরপুর। আশা করি, ভূগোলের ধারণাগুলি শিক্ষার্থীর কাছে এইভাবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নির্ভর হবে। তাদের ব্যাখা করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে বইটির ব্যবহার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রস্তাবও মুদ্রিত হলো।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

মার্চ, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অপর্ণা বেরা রায়চৌধুরী

অনিন্দিতা দে

শান্তনু প্রসাদ মণ্ডল

রুবি সরকার

বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী

শক্তি মণ্ডল

শুভনীল গুহ

পরামর্শ ও সহায়তা

সুস্মিতা গুপ্ত

পুস্তক সজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত মাজী

মুদ্রণ সহায়তা: বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

১। পৃথিবীর অন্দরমহল (১)

২। অস্থিত পৃথিবী (২৮)

৩। শিলা (৭৫)

৪। চাপবলয় ও বায়ুপ্রবাহ (১২০)

৫। মেঘ-বৃষ্টি
(১৭৪)

৬। জলবায়ু অঞ্চল
(২০৭)

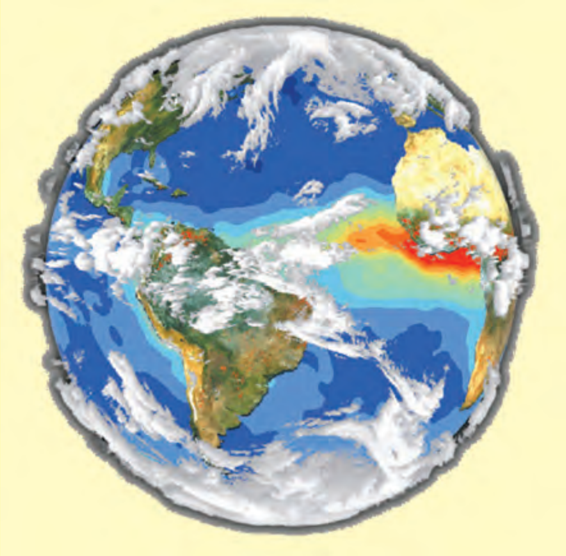

৭। মানুষের কার্যাবলি ও পরিবেশের অবনমন
(২৬৮)

৮। ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহ ও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক (২৯৭)

৯। উত্তর আমেরিকা (৩১৮)

১০। দক্ষিণ আমেরিকা (৩৮২)

১১। ওশিয়ানিয়া (৪২৭)

১

পৃথিবীর অন্দরমহল

‘আগামী ৪৮ ঘণ্টা গোটা রাজ্যে শৈত্যপ্রবাহ চলবে’ — সকালের কাগজে খবরটা পড়ে মেহতাবের শীত শীত ভাবটা যেন আর একটু বেড়ে গেল। হাড় কাঁপানো ঠান্ডা

হাওয়ায় সারা দেশ জবুথবু। পুরো উত্তর গোলার্ধ এখন শীতঋতুর কবলে। সৌরভদের বাড়ির ছাদে দুপুরবেলা রোদ পোহাতে পোহাতে দাদুর কাছে গল্প শুনতে দারুণ লাগে। রোববার, দাদু শোনাচ্ছিলেন জুল ভার্নের একটা বিখ্যাত কল্প বিজ্ঞানের গল্প। উনিশ বছরের এক ছেলে তার অধ্যাপক কাকার সাথে নিভে যাওয়া আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ভেতর দিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে অভিযান করে। তাদের যাওয়া-আসার পথের রোমহর্ষক কাহিনি দাদু এমনভাবে বর্ণনা করছিলেন যে রীতিমতো গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

ভূ-পৃষ্ঠের নীচে কী আছে জানতে, পরদিন ওরা দুজনে মিলে বাড়ির পিছনের বাগানে গর্ত খোঁড়া শুরু করল। বিকেলে যখন খোঁড়াখুঁড়ি শেষ করল তখন ওরা প্রায় ২ মিটার গভীরে দাঁড়িয়ে। স্কুলে এসে ওরা ঘটনাটা সবাইকে

বলল। সব শুনে ওদের মাথায় অনেকগুলো প্রশ্ন এল—

- পৃথিবীর যে শক্ত পিঠটার ওপর আমরা আছি তার নীচে কী আছে?
- কেউ কি কখনো দেখেছে পৃথিবীর ভেতরটা কেমন?
- পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত দেখতে গেলে কত গভীর গর্ত খুঁড়তে হবে?
- পৃথিবীর ভেতরটা কেমন তা কতটা জানা সম্ভব হয়েছে?
- পৃথিবীর ভেতরটা সম্পর্কে মানুষ যতটা জেনেছে, সেটুকু জানল কীভাবে?

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬৩৭০ কিমি। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দূরত্ব ৬৩৭০ কিমি।

ভেবে দেখো — পৃথিবীর ভেতরটা দেখার জন্য ৬৩৭০ কিমি গর্ত খোঁড়া সম্ভব কি?

দক্ষিণ আফ্রিকায় পৃথিবীর গভীরতম খনির (সোনা) গভীরতা ৩-৪ কিমি (রবিনসন ডীপ)।

জানা গেছে প্রতি ৩৩মি গভীরতায় প্রায় ১° সে. করে পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপমাত্রা বাড়ে। পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা যদি ১৫° সে. হয় তাহলে অঙ্কের হিসেবে রবিনসন ডীপের সোনার খনির শ্রমিকদের কত গরম সহ্য করতে হয়?

পৃথিবীর গভীরে কী আছে জানার জন্য খনি ছাড়াও উত্তর-পশ্চিম রাশিয়ার কোলা উপদ্বীপের ১২ কিমি গভীর গর্তটি হলো পৃথিবীর গভীরতম কৃত্রিম গর্ত।

পৃথিবীর গভীরতার (৬৩৭০ কিমি) কাছে ১২ কিমি খুবই নগণ্য।

তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ — পৃথিবীর অন্দরমহল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে যাওয়াটা কতটা কঠিন!

পৃথিবীর রহস্য

- আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে গলিত অর্ধতরল উত্তপ্ত লাভা বের হয়।
- কখনো কখনো প্রবল ভূমিকম্পে ভূ-পৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে।
- উষ্ণ প্রস্রবণে ভূ-গর্ভ থেকে ফুটন্ত জল বের হয়।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে ঘটে যাওয়া এরকম ঘটনার খবর সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করে কোলাজ বানাও।

পৃথিবী কিন্তু মাঝে মধ্যেই বুঝিয়ে দেয় তার ভিতরে কী আছে। পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে। তখন পৃথিবী ছিল প্রচণ্ড উত্তপ্ত গ্যাসীয় পিণ্ড।

সময়ের সাথে সাথে উপরিপৃষ্ঠটা আগে ঠান্ডা হয়ে শক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ এখনও বিরাট বড়ো অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে।

বাটিতে গরম দুধ ঢাললে ওপরটা ঠান্ডা হয়ে সর পড়ে। কিন্তু নীচটা অনেকক্ষণ গরম থাকে।

ম্যাগমা কী?

—ভূ-গর্ভের পদার্থ প্রচণ্ড চাপ ও তাপে গ্যাস, বাষ্প মিশ্রিত হয়ে গলিত অবস্থায় থাকলে তাকে ম্যাগমা বলে।

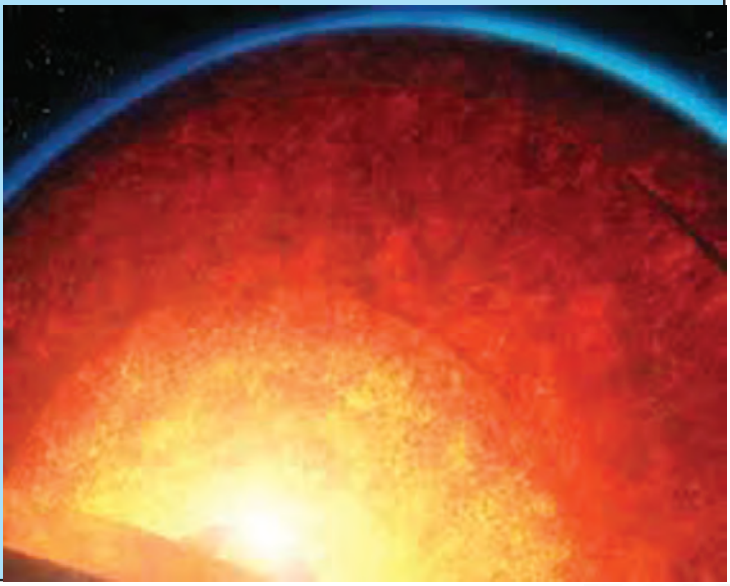

লাভা কী ? —ভূ-গর্ভের গলিত উত্তপ্ত অর্ধতরল ম্যাগমা ফাটল দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের বাইরে বেরিয়ে এলে তাকে লাভা বলে।

➤ তাপ বাড়লে পদার্থ গলে তরলে পরিণত হয় ও আয়তনে বাড়ে। আবার চাপ বাড়লে পদার্থের আয়তন কমে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে চাপ ও তাপ দুটোই খুব বেশি। তাহলে সেখানে পদার্থ কী অবস্থায় আছে?

বলোতো !

- কেন আমরা পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত যেতে পারি না?
- কেন আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে সরাসরি কোনো তথ্য পাই না?

বিশ্বদীপ বক্রেশ্বরে বেড়াতে গিয়ে উষ্ণ প্রস্রবণ (hot spring) দেখেছিল। মাটির নীচ থেকে আপনা-আপনি

গরম ফুটন্ত জল বেরিয়ে আসছে অনবরত। ও মাকে জিজ্ঞেস করতে জানল পৃথিবীর ভৌমজল (পৃথিবীর ভেতরকার জল) ভূ-তাপের (পৃথিবীর ভেতরকার তাপ) সংস্পর্শে এসে গরম হয়ে ফুটতে শুরু করে। পৃথিবীপৃষ্ঠের ফাটলের মধ্যে দিয়ে সেই জল বাইরে বেরিয়ে আসে।

ভূ-তাপ কী?—ভূ-তাপ হলো একধরনের শক্তি। পৃথিবীর কেন্দ্রের তাপ ধীরে ধীরে বাইরের দিকে অর্থাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠের দিকে আসতে থাকে। এই তাপশক্তিকে ভূ-তাপ শক্তি বলে। পৃথিবীর বহু দেশে এই তাপ-শক্তি

থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। আইসল্যান্ড তাদের দেশের বিদ্যুতের চাহিদার প্রায় ৩০% ভূ-তাপ শক্তি দ্বারা মেটায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভূ-তাপ শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। ভূ-তাপ শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে জীবাশ্ম জ্বালানির (কয়লা, খনিজতেল) ব্যবহার কমানো যায়। ভারতের কোথায় কোথায় ভূ-তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে জানার চেষ্টা করো।

পৃথিবীর ঘনত্ব

ভূ-পৃষ্ঠের গড় ঘনত্ব মাত্র ২.৬ থেকে ৩.৩ গ্রাম/ঘন সেমি। পৃথিবীর কেন্দ্রের কাছে পদার্থের গড় ঘনত্ব প্রায় ১১ গ্রাম/ঘন সেমি। সেটা বেড়ে পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রে প্রায় ১৩-১৪ গ্রাম/ঘন সেমি হয়। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহের বিচারে সামগ্রিক ভাবে পৃথিবীর গড় ঘনত্ব ৫.৫ গ্রাম/ঘন সেমি।

ঘনত্ব (Density) কী ?

একক আয়তনে পদার্থের কতটুকু ভর আছে তার পরিমাপকে পদার্থের ঘনত্ব বলে। প্রতি ঘন সেমি জায়গায় পদার্থের ভর কতটা সেটাই পদার্থের ঘনত্ব। পদার্থের অণু পরমাণুগুলি কত কাছাকাছি — বা কত দূরে দূরে আছে তার ধারণা হতে পারে ঘনত্ব জানা থাকলে। একই মাপের একটা লোহার পাত ও একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত হাতে নিয়ে দেখলে কোনটা ভারী লাগবে? আর কেনই বা লাগবে নিজেই বুঝে নাও।

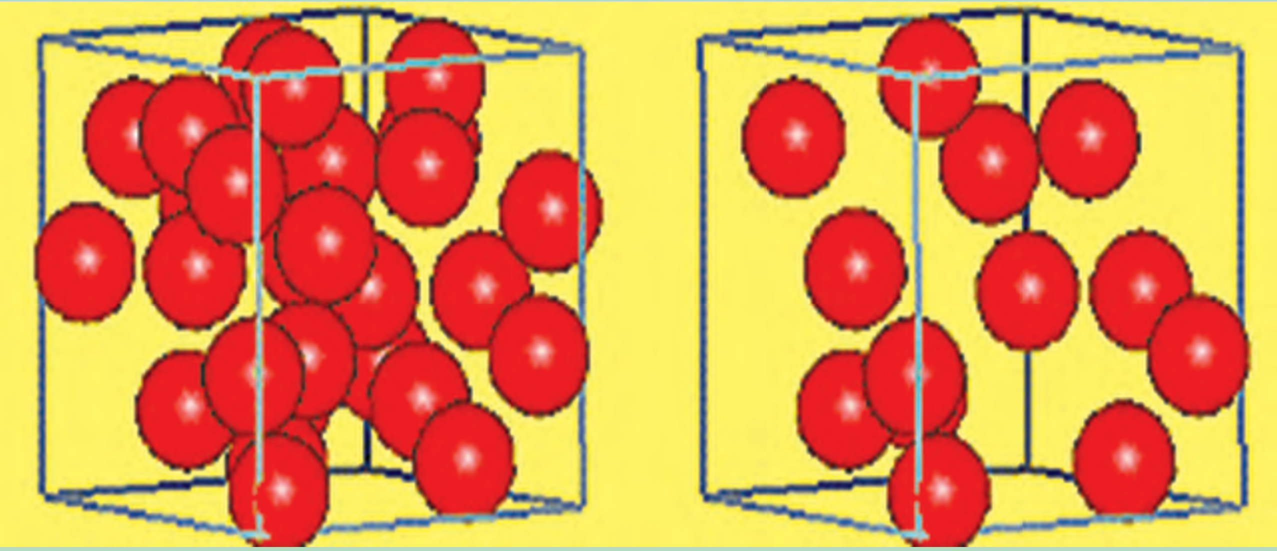

এখন প্রশ্ন হলো — পৃথিবীর কেন্দ্রের কাছে থাকা পদার্থগুলোর ঘনত্ব বেশি হয় কেন?

ভারী জিনিস নীচে থিতিয়ে পড়ে। হালকা জিনিস ওপরে

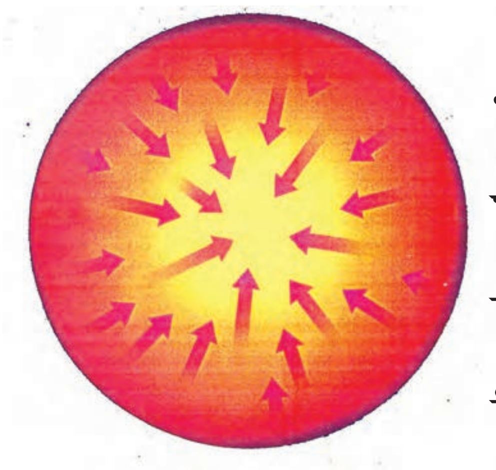

ভেসে ওঠে। পৃথিবীর জন্মের সময় খুব গরম ও বেশি ঘন পদার্থ মাধ্যাকর্ষণের টানে কেন্দ্রের দিকে চলে যায়। বিশেষত লোহা আর নিকেল পৃথিবীর কেন্দ্রের চারিদিকে আবর্তন করতে থাকে। অপেক্ষাকৃত হালকা অ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকা ওপরের দিকে ভেসে ওঠে।

স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যত যাওয়া যায় তত পদার্থের চাপ বাড়ে। চাপ বাড়লে পদার্থের ঘনত্ব যেমন বেড়ে যায় তেমন

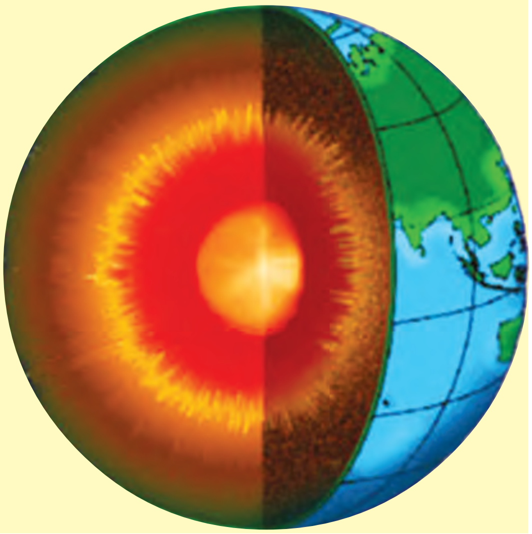

বেশি ঘন পদার্থ চাপ দেয় বেশি। পৃথিবীর অভ্যন্তরে ক্রমশ তাপ ও চাপ বাড়ার ফলে ভিতরের পদার্থগুলো কোথাও কঠিন, কোথাও তরল আবার কোথাও অর্ধতরল অবস্থায় আছে।

নিজে পরীক্ষা করে দেখো —

➤ কিছুটা নুড়ি, পাথর, মাটি নাও। কাঁচের গ্লাসে অর্ধেক জল ভর্তি করো। ওগুলো গ্লাসে ঢেলে নাড়িয়ে দিয়ে দেখো কী হয়।

ভূমিকম্প তরঙ্গ

ভূমিকম্পের তরঙ্গের গতিবিধি লক্ষ করেও বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তরঙ্গগুলো বিভিন্ন ধরনের পদার্থের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় কখনো দীর্ঘ, কখনো ক্ষুদ্র আবার কখনো দ্রুত বা ধীর গতিসম্পন্ন হয়। কম্পন তরঙ্গগুলো (P ও S)

ভূ-অভ্যন্তর দিয়ে কোথায় কী গতিতে যাচ্ছে, কীভাবে অভিমুখ পাল্টাচ্ছে— এসব কিছুই পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে তথ্য দেয়। ভূমিকম্পের P তরঙ্গ ভূ-অভ্যন্তরের কঠিন তরল যেকোনো মাধ্যমের মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু S তরঙ্গ তরল বা অর্ধতরল মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না।

পেঁয়াজের খোসা ছাড়ালে যেরকম স্তর বিন্যাস দেখা যায়, পৃথিবীর অন্দরমহলটা

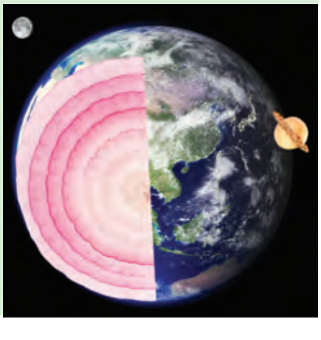

অনেকটা সেরকম বিভিন্ন ঘনত্বের ও বৈশিষ্ট্যের স্তরে বিভক্ত।

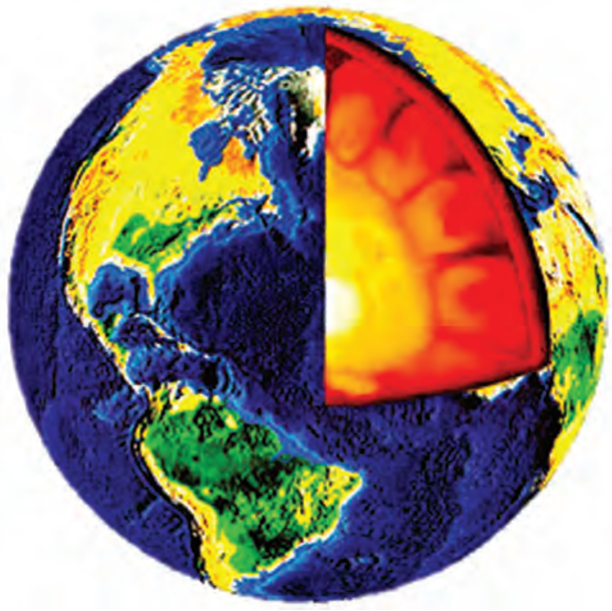

বর্তমানে পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে জানতে ভূমিকম্প তরঙ্গের গতিবিধি খুব সাহায্য করেছে। ভূমিকম্প তরঙ্গ ও আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে বেরোনো লাভা পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রধানত তিনটি স্তরের সন্ধান পেয়েছেন। একেবারে ওপরে আছে ভূ-ত্বক (Crust)। ভূ-ত্বকের নীচে আছে গুরুমণ্ডল (Mantle)। আর একেবারে নীচে বা পৃথিবীর কেন্দ্রের চারদিকে অবস্থান করছে কেন্দ্রমণ্ডল (Core)।

' Journey to the Centre of the Earth'—পৃথিবী বিখ্যাত কল্প- বিজ্ঞানের গল্প, জুল ভার্নের লেখা। গল্পটি পড়ে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো, খুব মজা পাবে।

ভূ-ত্বক →

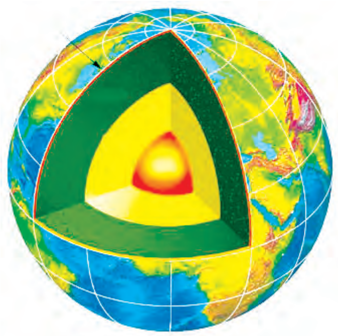

কাটা আপেলের খোসার সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে ওপরের স্তর ভূত্বকের তুলনা করা যায়।

➤ ভেবে দেখ আপেলের খোসা গোটা আপেলের তুলনায় কত পাতলা!

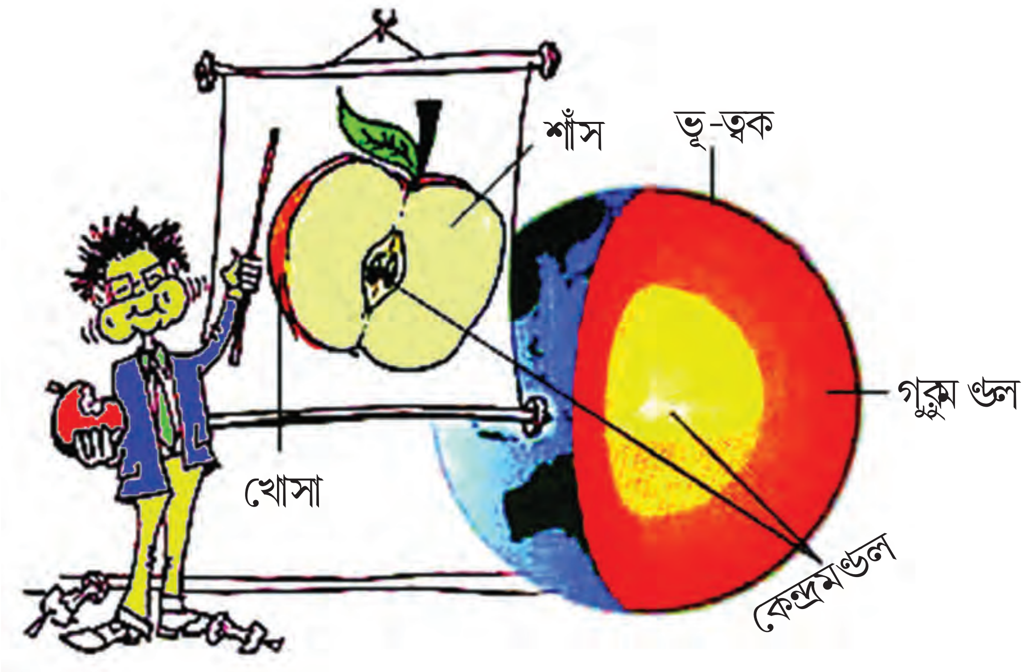

মহাসাগরের নীচে ভূত্বক গড়ে ৫ কিমি ও মহাদেশের নীচে গড়ে ৬০ কিমি গভীর। এর গড় গভীরতা প্রায় ৩০

কিমি। মহাসাগরের নীচে প্রধানত সিলিকন (Si) আর ম্যাগনেশিয়াম (Mg) দিয়ে তৈরি স্তরটি হলো সিমা (SIMA)। এই স্তর তুলনায় ভারী । প্রধানত ব্যাসল্ট জাতীয় আগ্নেয়শিলা এই স্তর গঠন করেছে। এর ঘনত্ব ২.৯ গ্রাম / ঘনসেমি। মহাদেশের নীচে প্রধানত সিলিকন (Si) আর অ্যালুমিনিয়াম (Al) দিয়ে তৈরি ভূত্বকের ওপরের স্তরটি হলো সিয়াল (SIAL)। গ্রানাইট জাতীয় আগ্নেয় শিলা এই স্তর গঠন করেছে। এই স্তর সিমার চেয়ে হালকা এবং একটানা নয়। সমুদ্রের নীচে এই স্তর অনুপস্থিত। সিমা বা মহাসাগরীয় ভূত্বকের ওপরে সিয়াল অবস্থান করছে।

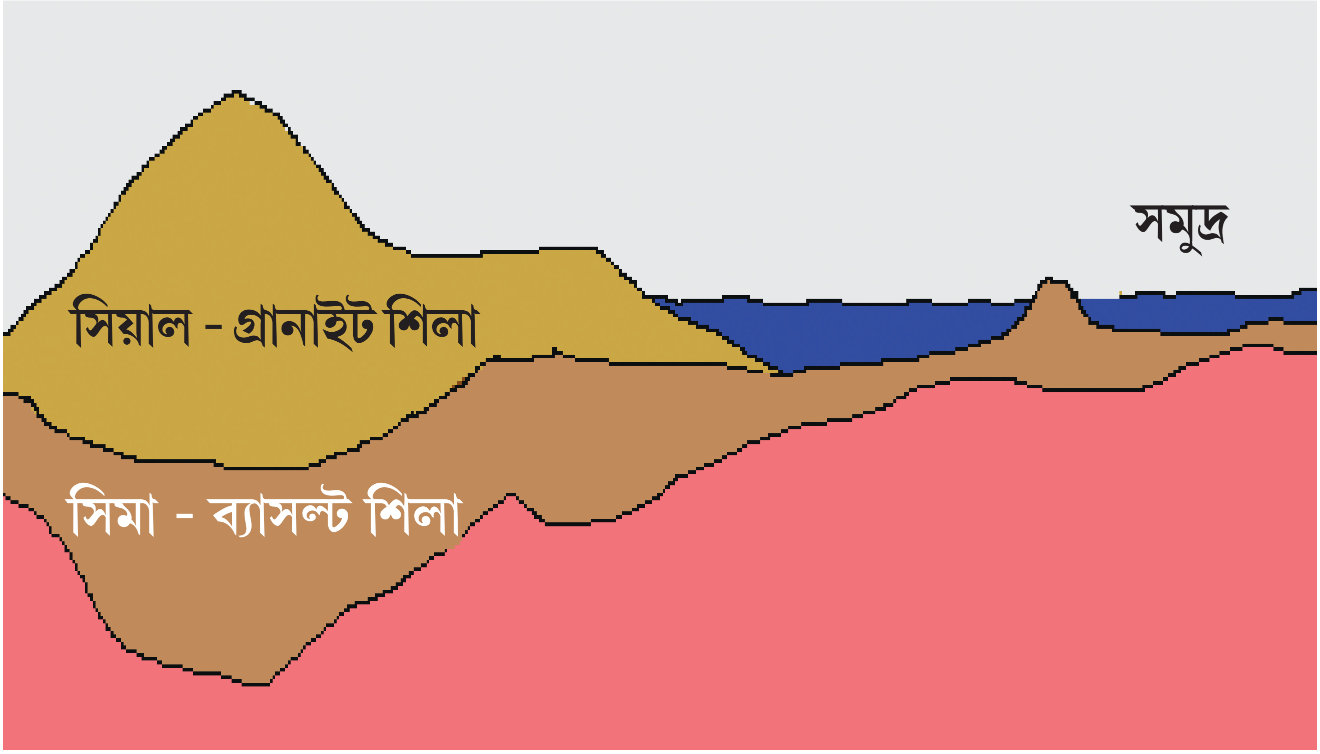

সিয়াল

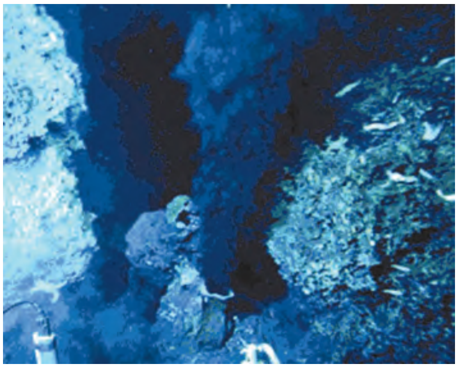
সিমা

পৃথিবীর সবচেয়ে বাইরের এই স্তর অত্যন্ত পাতলা। ভূ ত্বকের শিলা নানা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ভূত্বকের একেবারে ওপরে আছে মাটি।

ভূত্বকের বেশিরভাগ অংশ (৪৭ শতাংশ) জুড়ে আছে অক্সিজেন। বায়ুমণ্ডলের চেয়ে অনেক বেশি অক্সিজেন পৃথিবীর ভূ-ত্বকের সঙ্গে নানা রাসায়নিক অবস্থায় মিশে আছে। ভূত্বকের দ্বিতীয় প্রধান উপাদান হলো সিলিকন।

জানো কী !

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত যেখানে যেখানে ভূমিকম্পের তরঙ্গের গতিবেগ পরিবর্তিত হয় সেখানটাকে ভূ-তত্ত্ববিদরা বলেন বিযুক্তিরেখা (Discontinuity)। বিযুক্তিরেখা দ্বারা দুটি ভিন্ন উপাদান ও ঘনত্বের স্তরকে আলাদা করা যায়। সিয়াল ও সিমা স্তরের মাঝে আছে কনরাড বিযুক্তিরেখা (Conrad Discontinuity)।

গুরুমণ্ডল →

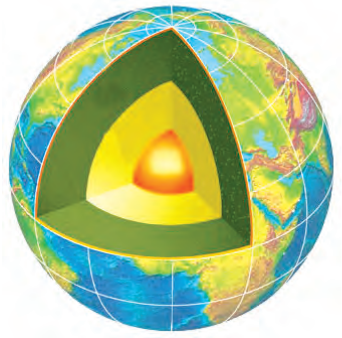

ভূ-ত্বক ছাড়িয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রায় ২৯০০ কিমি পর্যন্ত একই ঘনত্বযুক্ত স্তর হলো গুরুমণ্ডল

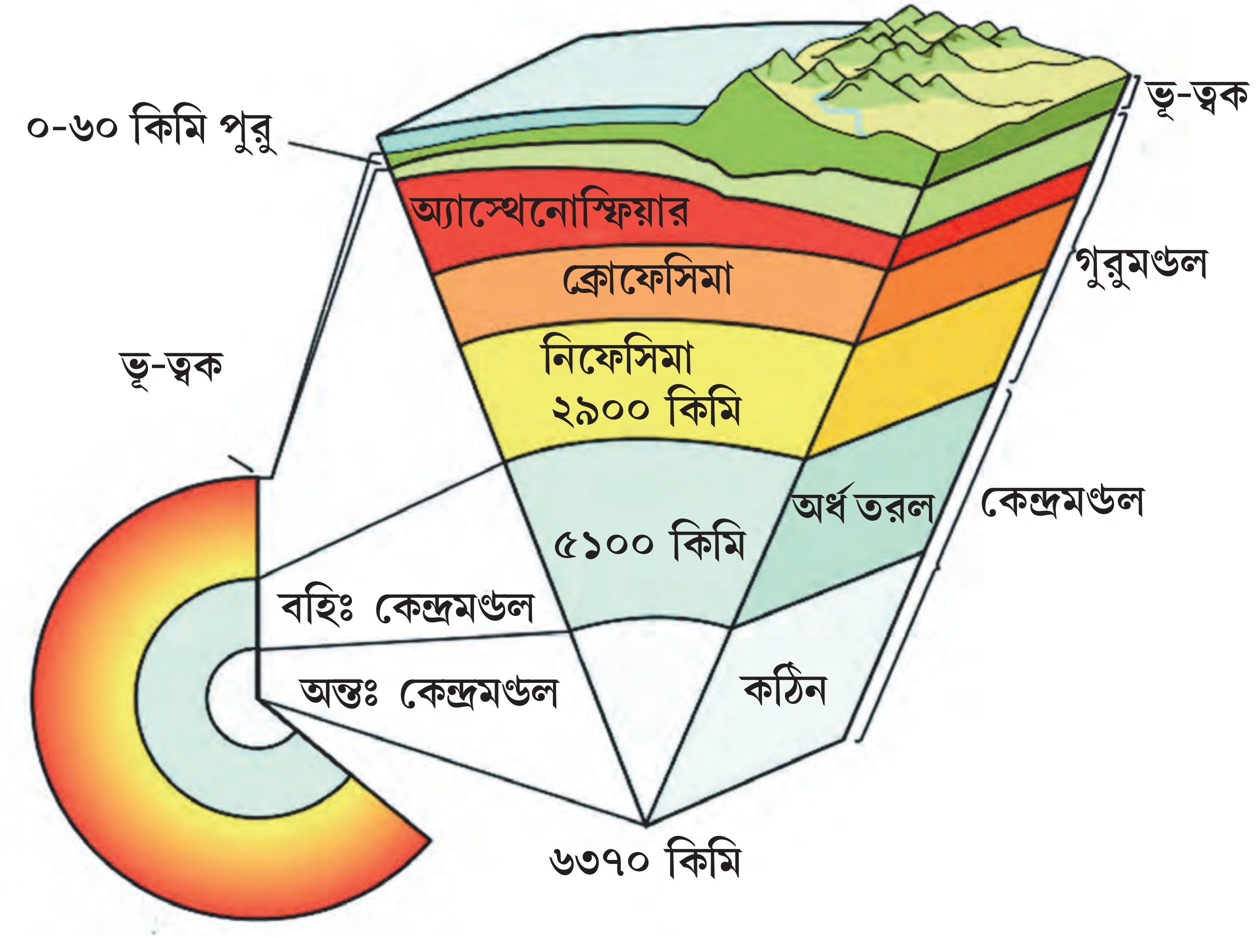

(Mantle)। এই স্তরের উষ্ণতা ২০০০° সে — ৩০০০° সে। পদার্থের ঘনত্ব ৩.৪ — ৫.৬ গ্রাম/ঘনসেমি। এই স্তরের প্রধান উপাদান লোহা, নিকেল, ক্রোমিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও সিলিকন।

গুরুমণ্ডলের ৩০—৭০০ কিমি পর্যন্ত অংশে ক্রোমিয়াম (Cr), লোহা (Fe), সিলিকন (Si) ও

ম্যাগনেশিয়ামের (Mg) প্রাধান্য দেখা যায়। এটি হলো ক্রোফেসিমা (Cro + Fe+ Si+Ma) স্তর। আর গুরুমণ্ডলের ৭০০- ২৯০০ কিমি পর্যন্ত অংশে নিকেল (Ni), লোহা (Fe) সিলিকন (Si), ও ম্যাগনেশিয়ামের(Mg) আধিক্যের জন্য এই স্তর হলো নিফেসিমা (Ni + Fe+ Si +Ma)।

➢ আপেলের কোন অংশ গুরুমণ্ডলের সঙ্গে তুলনীয়?

ভূত্বক ও গুরুমণ্ডলের মাঝে আছে মোহোরোভিসিক বিযুক্তিরেখা (Mohrovicic Discontinuity) বা মোহো।

ক্রোফেসিমা ও নিফেসিমার মাঝে আছে রেপিত্তি বিযুক্তিরেখা। (Repetti Discontinuity)।

অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার

শিলামণ্ডলের নিচে গুরুমণ্ডলের ওপরের অংশে বিশেষ স্তরটি হলো অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার

(Asthenosphere)। Asthenosphere একটি গ্রিক শব্দ, যার মানে দুর্বল স্তর। এই স্তরে পদার্থ গলিত ও নরম প্রকৃতির। অত্যধিক তাপ ও চাপে এখানকার শিলা সান্দ্র (অর্ধ তরল অর্ধ কঠিন) অবস্থায় আছে। পিচ গলালে বা খেজুরের রস জাল দিয়ে গুড় তৈরি করলে যে অবস্থায় থাকে সেইরকম অবস্থায় এখানকার পদার্থগুলি আছে। ভূগর্ভের তাপে পদার্থগুলি উত্তপ্ত হয়ে ওপরের দিকে উঠে এসে অনুভূমিকভাবে প্রবাহিত হয়। আবার ওপরের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা, ভারী পদার্থ নীচের দিকে নেমে যায়। এই ভাবে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়।

ভূত্বক ও গুরুমণ্ডলের উপরিঅংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে শিলামণ্ডল। এর গভীরতা প্রায় ১০০ কিমি।

ভূকম্প তরঙ্গ এই স্তরের মধ্যে দিয়ে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের নীচে এই স্তর কাছাকাছি অবস্থান করে। পরিচলন স্রোত ভূগর্ভের তাপকে ওপরের দিকে বয়ে নিয়ে আসে।

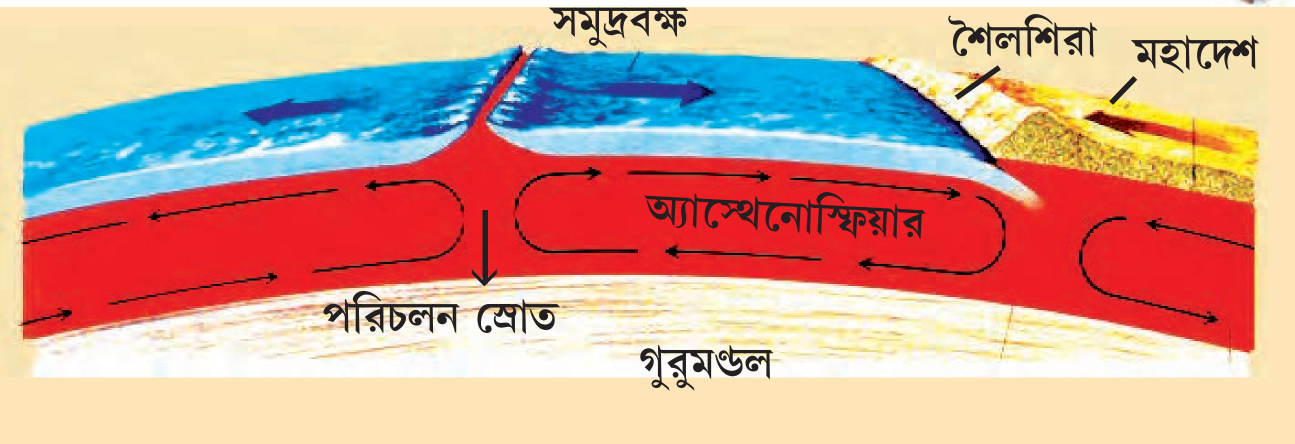

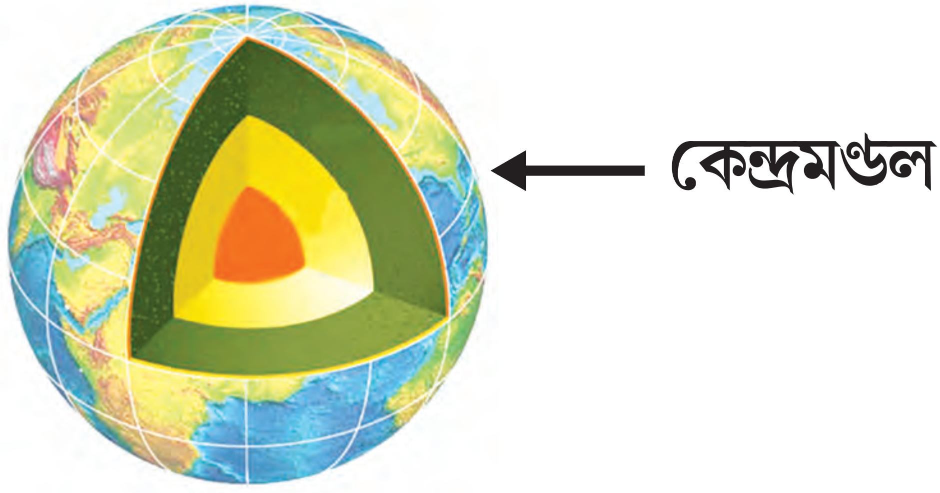

ভূত্বক ও গুরুমণ্ডলের পরবর্তী এবং কেন্দ্রের চারদিকে বেষ্টনকারী শেষ স্তরটি হলো কেন্দ্রমণ্ডল (Core)। এই স্তরটি প্রায় ৩৫০০ কিমি পুরু। অত্যন্ত ভারী নিকেল (Ni) আর লোহা (Fe) দিয়ে তৈরি বলে একে (Nife) 'নিফে' বলে। এর গড় তাপমাত্রা প্রায় ৫০০০° সে। এই স্তরের গড় ঘনত্ব প্রায় ৯.১ থেকে

১৩.১ গ্রাম/ঘনসেমি। পদার্থের ঘনত্ব, উষ্ণতা, চাপ কেন্দ্রমণ্ডলের সবজায়গায় একরকম নয়। এগুলোর ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা কেন্দ্রমণ্ডলকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছেন —

➤ আপেলের কোন অংশটা কেন্দ্রমণ্ডলের মতো বলো তো?

(১) **অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডল** — এই স্তর পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রের চারদিকে রয়েছে। এই স্তরের গভীরতা ৫১০০ কিমি থেকে প্রায় ৬৩৭০ কিমি। এই স্তরের চাপ, তাপ,

ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। অত্যধিক চাপের ফলে পদার্থগুলো এখানে কঠিন অবস্থায় আছে।

(২) **বহিঃকেন্দ্রমণ্ডল** —অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডলের চারদিকে রয়েছে বহিঃকেন্দ্রমণ্ডল। এই স্তর ২৯০০ কিমি —৫১০০ কিমি পুরু। এর চাপ, তাপ ও ঘনত্ব অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডলের তুলনায় কম। এই স্তর অর্ধকঠিন অবস্থায় পৃথিবীর অক্ষের চারদিকে আবর্তন করে চলেছে। সান্দ্র অবস্থায় থাকা এই লোহা প্রচণ্ড গতিতে ঘুরতে ঘুরতে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করেছে, যেখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর চৌম্বকত্ব।

গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলের মাঝে আছে গুটেনবার্গ বিযুক্তিরেখা (Gutenberg Discontinuity)।

কেন্দ্রমণ্ডলের ভিতরের স্তর অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডল ও বাইরের স্তর বহিঃকেন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে লেহম্যান বিযুক্তিরেখা (Lehman Discontinuity)।

পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্বন্ধে জানতে যা মনে রাখা দরকার —

- পৃথিবীর অভ্যন্তর একাধিক পৃথক স্তরে বিভক্ত।
- অপেক্ষাকৃত ভারী পদার্থ নীচের দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে থিতিয়ে পড়ে।
- তুলনায় হালকা পদার্থ বা উপাদান ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি উঠে আসে।
- ভূ-ত্বক বা শিলামণ্ডল সম্বন্ধে যতটা জানা গেছে সে তুলনায় গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি।
- ভূকম্প তরঙ্গের গতিবিধি সম্পর্কিত গবেষণা থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়।

উত্তরগুলো খুঁজে ফেলো —

- গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডল প্রায় একইরকম পুরু। কিন্তু পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় ৮৪ শতাংশ দখল করে আছে গুরুমণ্ডল। এটা কীভাবে বা কেন হয় বলতে পারো?
- পৃথিবীর অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঘনত্বের পার্থক্য লক্ষ করা যায় কেন?
- সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে তুমি অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের পরিচলন স্রোত বুঝিয়ে দাও।

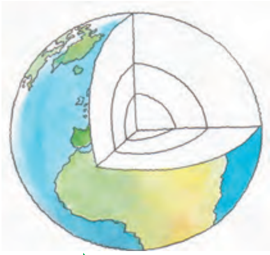

- ম্যাগমা ও লাভার মধ্যে তফাত কী?

➢ পৃথিবীর অভ্যন্তরের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো।

➢ থার্মোকলের সাহায্যে পৃথিবীর অন্দরমহলের মডেল তৈরি করো।

- পৃথিবীর বাইরের আর পৃথিবীর ভিতরের সম্পর্কে তুমি জানো — তোমার কোনটা বেশি পছন্দের এবং কেন?

২

অস্থিত পৃথিবী

অগ্ন্যুৎপাত

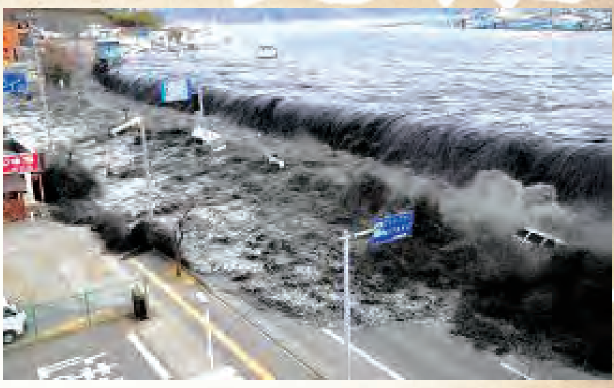

সুনামি

ভূমিকম্প

ভূমিধস

পৃথিবীকে আপাতভাবে শান্ত, স্থির বলে মনে হয়।

কিন্তু ওপরের ঘটনাগুলোকে দেখলে আমাদের ধারণা বদলে যায়। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও প্রতিনিয়ত ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ভূপৃষ্ঠের সরণ,

পর্বত সৃষ্টি, ধস, হিমানী সম্প্রপাত প্রভৃতি ঘটনা ঘটে চলেছে। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছেন যে এর প্রধান কারণ হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের চলন বা সরণ। আমাদের পায়ের তলার ভূপৃষ্ঠটা প্রতিনিয়ত সরছে আর আমরা বুঝতেই পারছি না! বিষয়টা একটু বিস্তারিত বুঝে নেওয়া যাক।

আলফ্রেড ওয়েগনারের 'মহীসঞ্চরণ তত্ত্ব' (Continental Drift Theory) থেকে জানা যায় — প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগ একটা বিশাল ভূখণ্ডরূপে (প্যানজিয়া) অবস্থান করত। পরবর্তীকালে 'প্যানজিয়া' ভেঙে গিয়ে বিভিন্ন দিকে সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ মহাদেশীয় ভূত্বক (SIAL) বিচ্ছিন্নভাবে মহাসাগরীয় ভূত্বকের (SIMA) ওপর বিভিন্ন দিকে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু 'মহীসঞ্চরণ তত্ত্ব' থেকে মহাদেশ মহাসাগর সৃষ্টি,

পর্বত গঠন, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুদগমের মতো ঘটনার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই ১৯৬০-এর দশকে পাত সংস্থান তত্ত্ব (Plate Tectonic Theory) -এর মাধ্যমে ভূবিদ্যায় এক যুগান্তকারী আবিষ্কার ঘটে, যা প্রায় সমস্তরকম ভূপ্রাকৃতিক বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে। পিঁচো, উইলসন, ম্যাকেনজি, পার্কার, মর্গান প্রভৃতি ভূবিজ্ঞানীরা পাত সংস্থান সম্পর্কে গবেষণা করেন।

ভূবিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর ভূত্বক কতকগুলো শক্ত (rigid) ও কঠিন (solid) খণ্ডে বিভক্ত। এগুলোকে ভূবিজ্ঞানীরা এক একটা 'পাত' বলেছেন। পাতগুলোর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের তুলনায় বেধ খুবই কম। পাতগুলো গড়ে ৭০-১৫০ কিমি পুরু। ভূপৃষ্ঠ থেকে

বহিঃগুরুমণ্ডলের অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার স্তর পর্যন্ত পাতগুলো বিস্তৃত। পিচ্ছিল অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের ওপর পাতগুলো খুব ধীরগতিতে সঞ্চরণ করছে। অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের পরিচলন স্রোত এর অন্যতম কারণ। পাতগুলো তাদের সীমানা বরাবর কখনো একে অপরের দিকে, কখনো বিপরীত দিকে আবার কখনো বা পাশাপাশি ঘর্ষণ করে অগ্রসর হয়। এর প্রভাবে পাত সীমানা বরাবর ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ভঙ্গিল পর্বত, সমুদ্রখাত, দ্বীপমালা প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে মোট ছটি বড়ো পাত এবং কুড়িটি মাঝারি ও ছোটো পাত রয়েছে। ছটি বড়ো পাত হলো ইউরেশিয় পাত, ইন্দো-অস্ট্রেলিয় পাত, আমেরিকা পাত, প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত, আফ্রিকা পাত এবং আন্টার্কটিকা পাত।

১৯৬০ দশকের এক যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হলো পাতের চলন সম্পর্কিত পাত সংস্থান তত্ত্ব। পিঁচো, উইলসন, ম্যাকেনজি, পার্কার, মর্গান প্রভৃতি বহু ভূবিজ্ঞানীর এই তত্ত্ব সৃষ্টিতে অবদান আছে।

পাতের চলন ও ভূতাত্ত্বীয় ঘটনা : আগেই বলা হয়েছে ভূ ত্বকের এই পাতগুলো সর্বদা ধীরগতিতে সঞ্চরণশীল। সাধারণভাবে দেখা যায় সমুদ্র তলদেশে পাতের সীমানা বরাবর দুটো পাত পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর ফলে সমুদ্র তলদেশে যে ফাঁকের সৃষ্টি হয় তা দিয়ে ভূঅভ্যন্তরের ম্যাগমা ক্রমাগত বেরিয়ে আসে। এই ম্যাগমা পরে শীতল ও কঠিন হয়ে নতুন

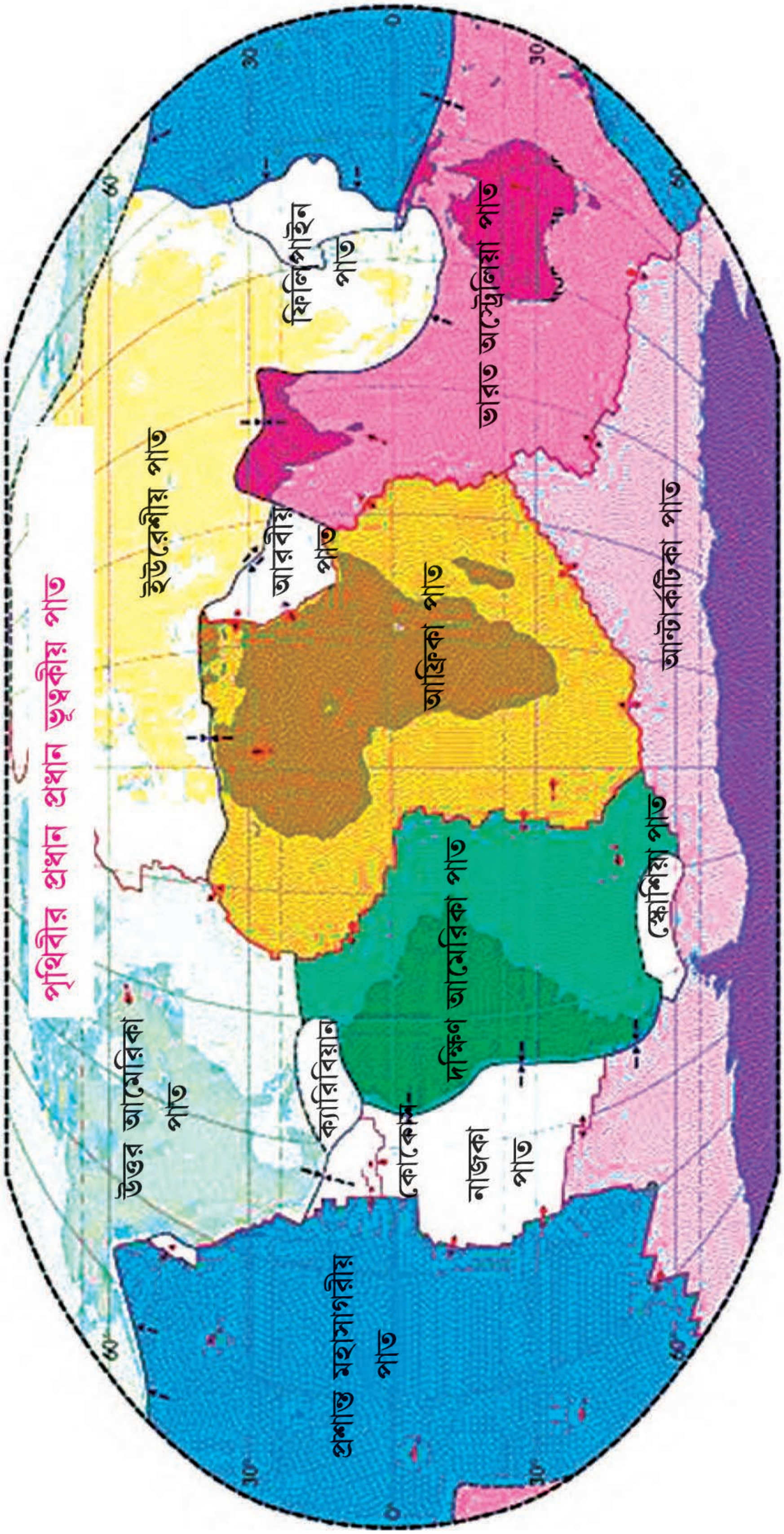
পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভূত্বকীয় পাত
উত্তর আমেরিকা পাত
ইউরেশীয় পাত
আরবীয় পাত
ফিলিপাইন পাত
ভারত অস্ট্রেলিয়া পাত
আফ্রিকা পাত
অ্যান্টার্কটিকা পাত
স্কোশিয়া পাত
দক্ষিণ আমেরিকা পাত
ক্যারিবিয়ান
কোকোস
নাজকা পাত
প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত

ভূত্বক (বা পাত) এবং সমুদ্রের তলদেশে মধ্য-সামুদ্রিক শৈলশিরা গঠন করে। এই পরস্পর বিপরীতমুখী পাতসীমানাকে অপসারী বা গঠনকারী পাত সীমানা বলা হয়। এই অঞ্চলে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত স্বাভাবিক ঘটনা। আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে এই ধরনের ঘটনা দেখা যায়।

অনেক সময় দুটো পাত পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয় এবং পাতের সংঘর্ষ ঘটে। দুটো পাতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভারী পাত হালকা পাতের নীচে প্রবেশ করে। এর ফলে নিমজ্জিত পাতটির গলন হয়, সমুদ্রখাত সৃষ্টি হয় ও

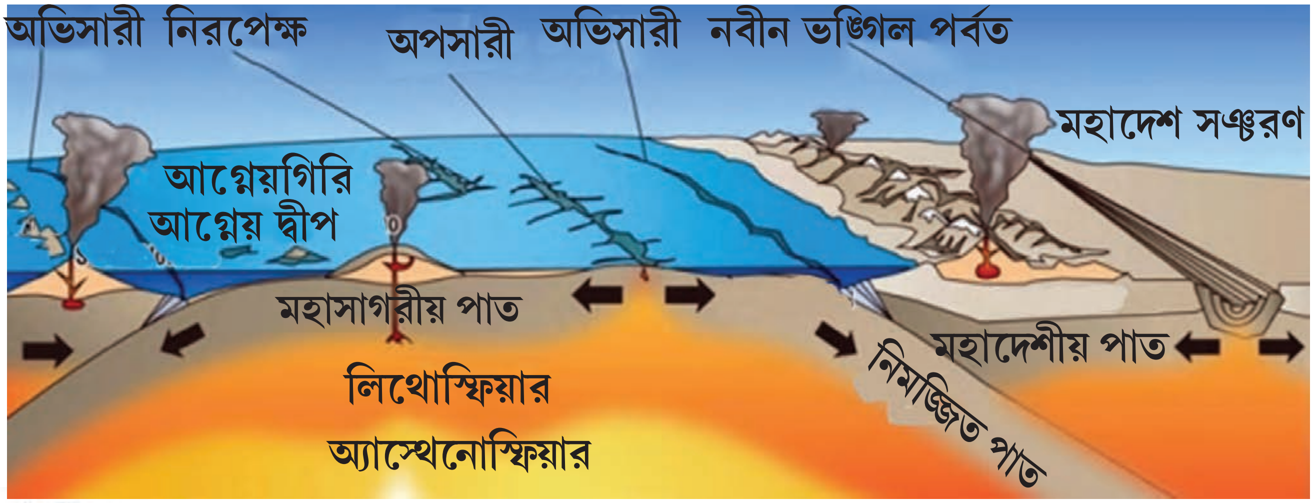

ভূত্বকের বিনাশ ঘটে। এই অঞ্চলে প্রতিনিয়ত ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা দেখা যায়। দুটো পরস্পরমুখী পাত সামুদ্রিক হলে তাদের ওপরের পলি ভাঁজ খেয়ে দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূল বরাবর জাপান ও সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জ এভাবে গড়ে উঠেছে। পাত দুটোর একটি সামুদ্রিক ও আর একটি মহাদেশীয় হলে মাঝের পলি ভাঁজ খেয়ে ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণি সৃষ্টি করে। আমেরিকার পশ্চিম ভাগের রকি ও আন্দিজ পর্বতমালা এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। আবার পাতদুটো মহাদেশীয় হলে সংঘর্ষের ফলে মাঝের সংকীর্ণ সমুদ্রের পলি ভাঁজ খেয়ে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয়। এইভাবে ইউরেশিয় ও ভারতীয় -এই দুই মহাদেশীয় পাতের মাঝের টেথিস সাগরের পলি ভাঁজ খেয়ে হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি করেছে। এই ধরনের পরস্পরমুখী পাত সীমানাকে অভিসারী বা বিনাশকারী পাত সীমানা বলা হয়।

মহাদেশ—মহাসাগর সংঘর্ষ

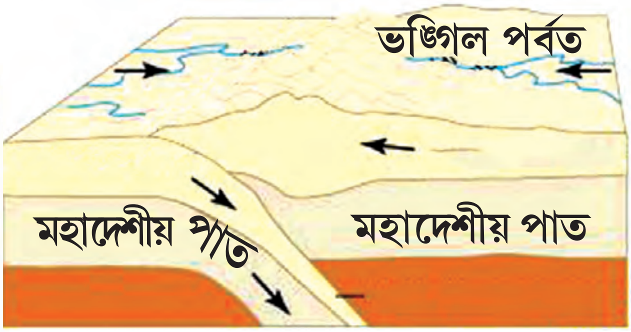

মহাদেশ — মহাদেশ সংঘর্ষ

কিছু ক্ষেত্রে দুটো পাত পরস্পর ঘর্ষণ করে পাশাপাশি অগ্রসর হয়। ফলে ভূমিকম্প, চ্যুতি প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। এই সীমান্তে পাতের ধ্বংস বা সৃষ্টি কিছুই হয় না। একে নিরপেক্ষ সীমানা বলা হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সান আন্দ্রিজ চ্যুতি এরকম সীমানার উদাহরণ। এই চ্যুতি বরাবর প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত উত্তরে ও উত্তর আমেরিকা পাত দক্ষিণে সরছে।

১—২.৫ কোটি বছর আগে যে ভঙ্গিল পর্বতগুলোর সৃষ্টি হয়েছে তারা হলো নবীন ভঙ্গিল পর্বত। যেমন রকি, আন্দিজ,

আল্পস্, হিমালয়। ২০ কোটি বছরেরও আগে সৃষ্টি হওয়া ভঙ্গিল পর্বতগুলো হলো প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত। যেমন--- উরাল, অ্যাপেলেশিয়ান, আরাবল্লী প্রভৃতি।

সান আন্দ্রিজ চ্যুতি

পাতসঞ্চালন আমরা বুঝতে পারি না কেন ?

পাতগুলো বিভিন্ন গতিতে, অনুভূমিকভাবে সঞ্চারিত হয়। এই চলন এত ধীর আর সুদীর্ঘ সময় ধরে চলে যে, আমরা তা বুঝতেই পারি না। প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত বছরে ১০ সেমি করে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। আবার আমেরিকান পাত পশ্চিমে সরছে বছরে মাত্র ২-৩ সেমি। তবে পাতের চলনের ফলে সৃষ্ট ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ধ্বস প্রভৃতি আমাদের নজরে আসে।

পাত সঞ্চরণ : এক নজরে

ছবিগুলো চিহ্নিত করো আর ঠিক ঠিক লিখে ফেলো—

পাত সীমানা	অপসারী	অভিসারী	নিরপেক্ষ
পাতের চলন	পরস্পর বিপরীতমুখী	————	পাশাপাশি সঞ্চরণ
প্রভাব	—————	সমুদ্রতলের বিনাশ	ভূত্বক সৃষ্টি/ধ্বংস হয় না
ভূমিরূপ	—————	সমুদ্রখাত সৃষ্টি	——— ——

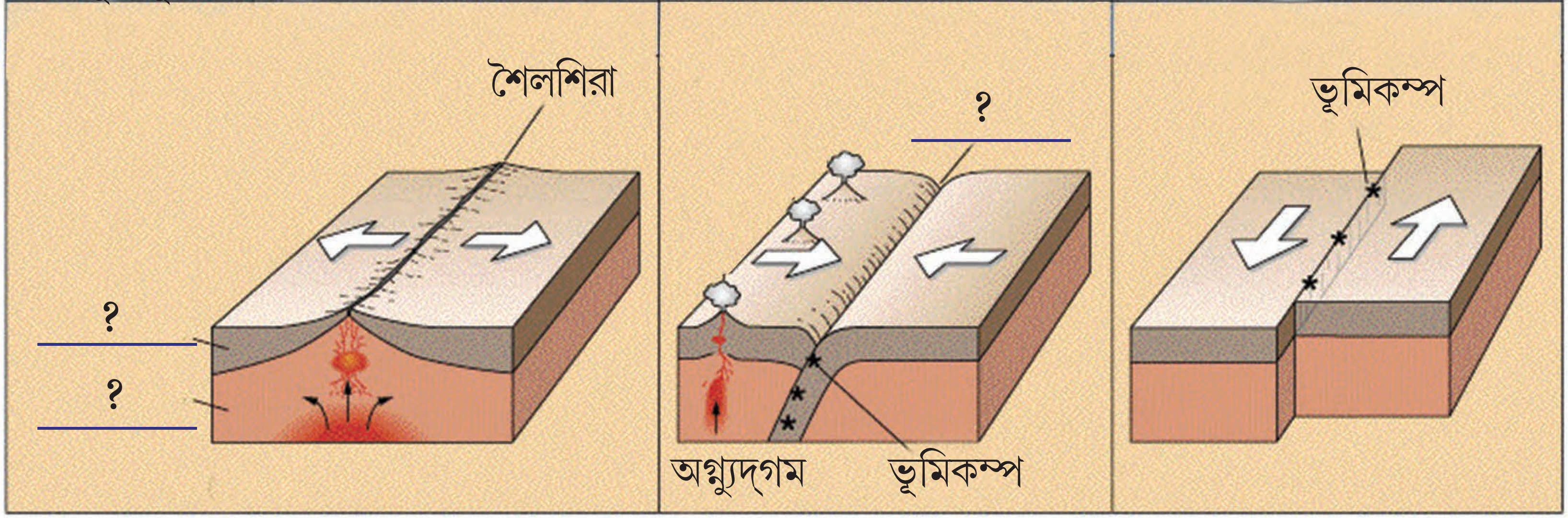

অগ্ন্যুদ্গম (VOLCANISM)

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত অন্যতম ভয়ংকর সুন্দর দৃশ্য। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে একাধিক জায়গায় অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে— উত্তপ্ত গলিত পদার্থ, গ্যাস, বাষ্প, ছাই, ভস্ম উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে; আগুনের স্রোতের মতো লাভা ছড়িয়ে পড়ছে আশেপাশে —

ভূঅভ্যন্তরের গলিত সান্দ্র ম্যাগমা, গ্যাস, জলীয়বাষ্প কোনো ফাটল বা গহ্বরের মধ্য দিয়ে বিস্ফোরণ সহ প্রচণ্ড জোরে অথবা ধীর শান্তভাবে ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়া হলো অগ্ন্যুদ্‌গম (Volcanism)। আর অগ্ন্যুৎপাতের উৎসগুলো হলো আগ্নেয়গিরি (Volcano)।

অগ্ন্যুদ্‌গমের সময় উৎক্ষিপ্ত পদার্থ ফাটল বা গহ্বরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে বার বার অগ্ন্যুৎপাতের সময় আগ্নেয় পদার্থ ফাটলের চারিদিকে জমা হয়ে শঙ্কু আকৃতির পর্বতের আকার ধারণ করে। সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্টি হয় বলে একে সঞ্চয়জাত বা আগ্নেয় পর্বত (Volcanic mountain) বলা হয়। জাপানের ফুজিয়ামা, ইতালির ভিসুভিয়াস, ভারতের ব্যারেন, ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়া — এই জাতীয় পর্বত। সুতরাং আগ্নেয়গিরি হলো অগ্ন্যুৎপাতের উৎস ও ফলাফল।

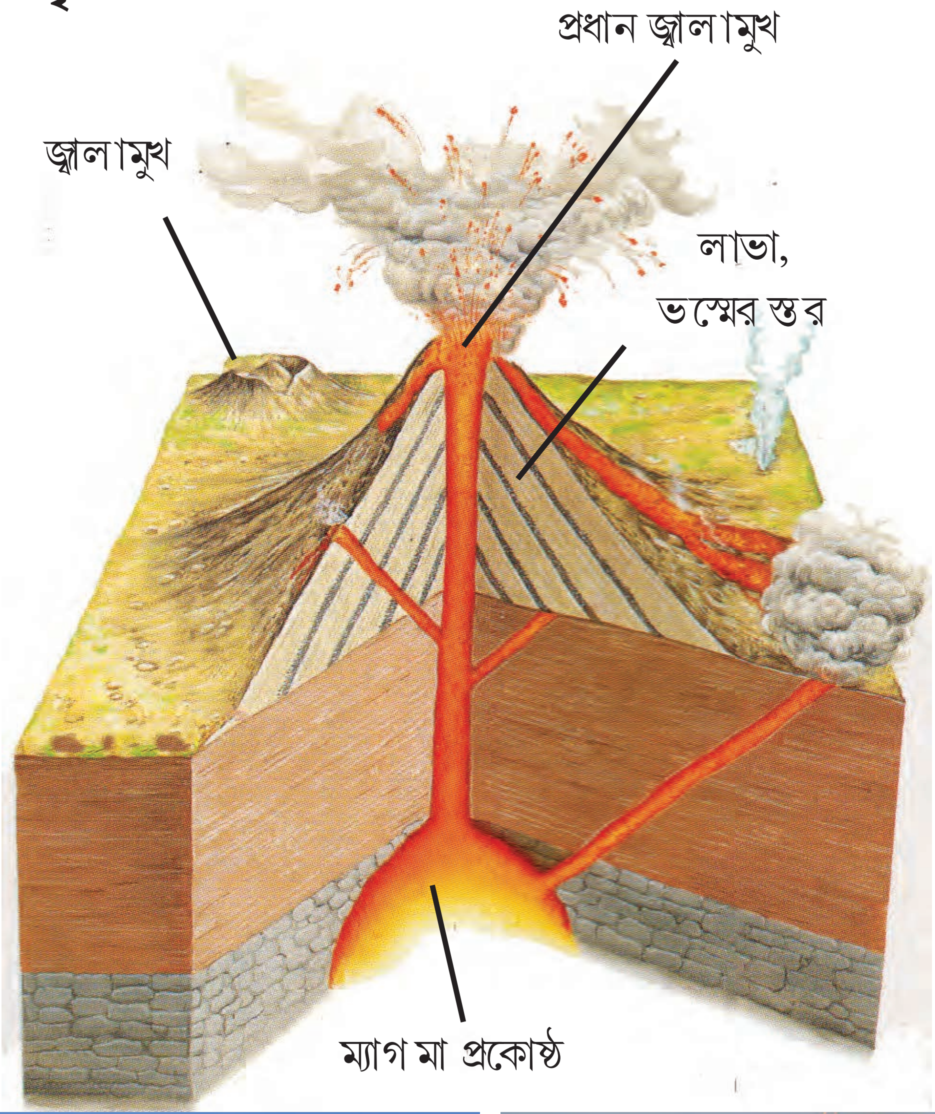

ফুজিয়ামা

ক্রাকাতোয়া

বিশেষ কথা

সৃষ্টির সময় থেকে কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে চলেছে।

- উৎক্ষিপ্ত লাভা, ছাই, আগ্নেয় পদার্থ স্তরে স্তরে জমে শীতল ও কঠিন হয়ে ভূ-ত্বকের অনেকটা অংশ গঠন করেছে।
- সৃষ্টির আদিলগ্নে আগ্নেয়গিরি নির্গত জলীয় বাষ্প থেকেই ঘনীভবনের মাধ্যমে সাগর-মহাসাগর তৈরি হয়।
- বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগে অগ্ন্যুদ্গমের মাধ্যমেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বর্তমানের অনুকূল অবস্থায় পৌঁছেছে।

পাত সংস্থান তত্ত্ব অনুসারে অভিসারী পাত সীমানায় বিস্ফোরণ সহ অগ্ন্যুৎগম ঘটে। আর অপসারী ও নিরপেক্ষ পাত সীমানায় বিস্ফোরণ ছাড়া শান্তভাবে

অগ্ন্যুদ্গম ঘটতে দেখা যায়। একে বিদার অগ্ন্যুদ্গম বলে। এইরকম বিদার অগ্ন্যুদ্গমের ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লাভা সঞ্চিত হয়ে লাভা মালভূমি (দাক্ষিণাত্য মালভূমি) বা লাভা সমভূমির সৃষ্টি হয়। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বেশ কিছু ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। তাই অগ্ন্যুৎগম একপ্রকার 'ভূগাঠনিক প্রক্রিয়া'।

সৃষ্টির সময় থেকে পৃথিবীতে একাধিক ভূগাঠনিক প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে। ভূ-অভ্যন্তরে হঠাৎ কোনো ভূআলোড়নের বহিঃপ্রকাশ হলো অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমিকম্প।

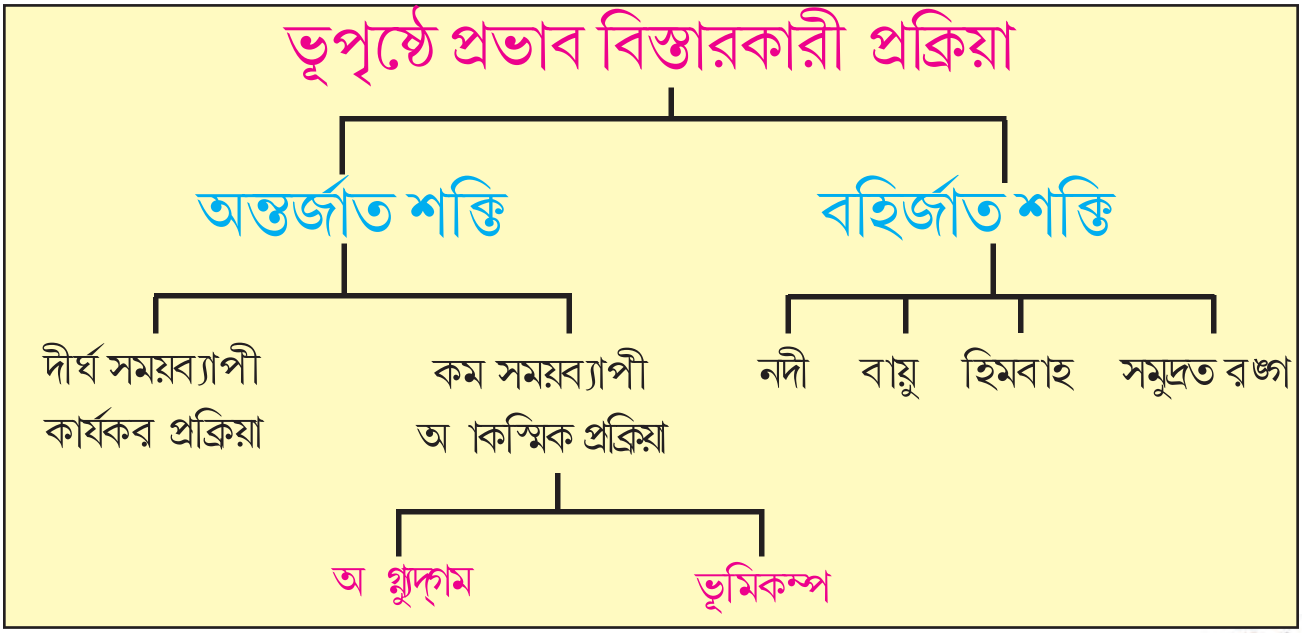

এবার জেনে নেওয়া যাক— অগ্ন্যুদ্‌গম কীভাবে হয়?

পৃথিবীর অভ্যন্তর অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে। গুরুমণ্ডলে ২০০০° সে. এ স্বাভাবিকভাবে শিলা গলে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওপরের স্তরের প্রবল চাপে গলনাঙ্ক বেড়ে যায়। ফলে শিলা আংশিক গলে, পিচ্ছিল হয়ে প্লাস্টিকের মতো প্রবাহিত হয়।

বহিঃগুরুমণ্ডলের কোনো কোনো অংশে শিলা সম্পূর্ণ গলে যায়। এই গলিত ম্যাগমার ঘনত্ব কম হয় এবং আশপাশের অর্ধগলিত শিলার তুলনায় হালকা বলে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে। ম্যাগমা যত ওপরে ওঠে, চাপ এবং গলনাঙ্ক দুটোই তত কমে যায়। তরল ম্যাগমার জলীয় অংশ গ্যাস ও জলীয় বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। এই বাষ্প, গ্যাস মিশ্রিত ম্যাগমা প্রবল চাপে ভূপৃষ্ঠের কোনো দুর্বল ফাটল দিয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়। ভূ-অভ্যন্তরের গলিত, সান্দ্র পদার্থকে 'ম্যাগমা' (Magma) আর ম্যাগমা ভূ-পৃষ্ঠের বাইরে নির্গত হলে তাকে 'লাভা'(Lava) বলা হয়।

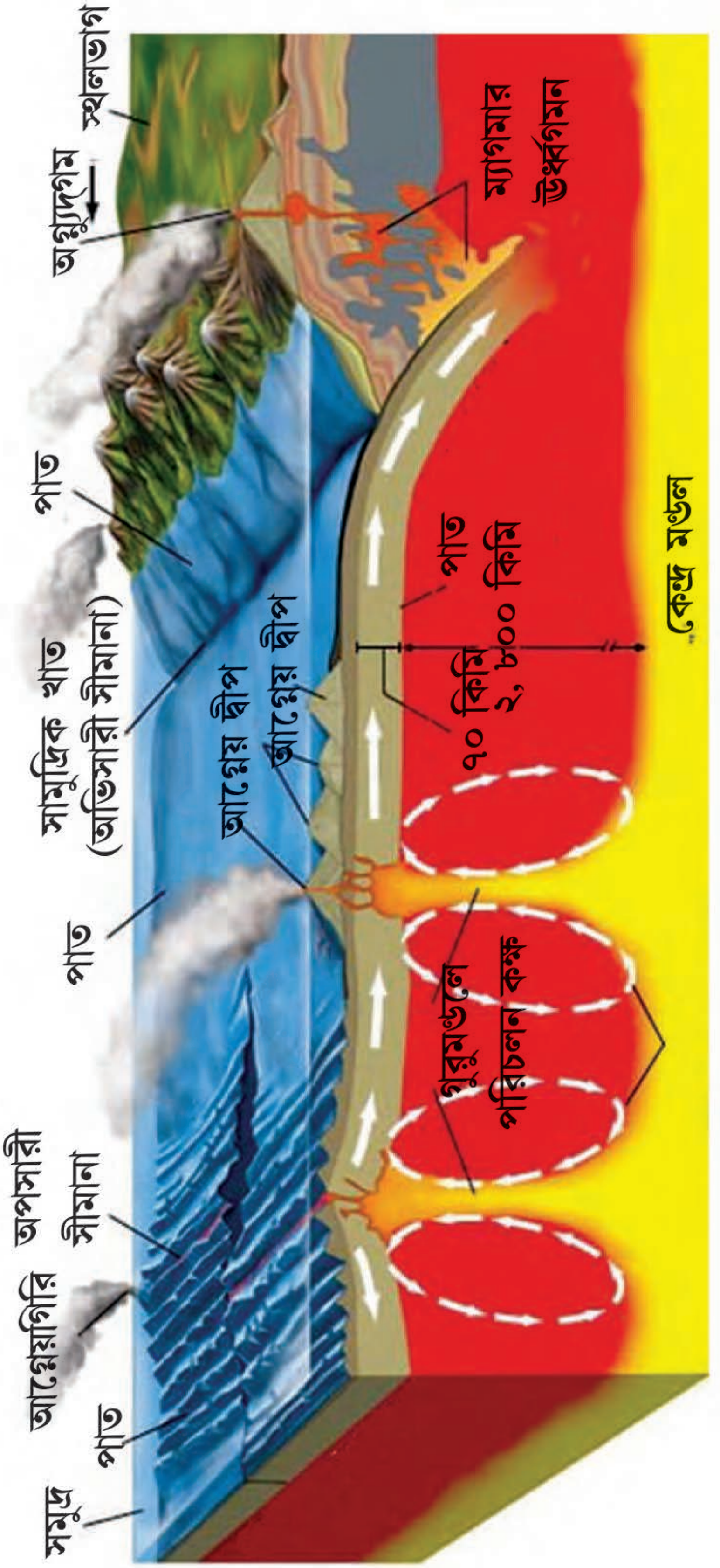
সমুদ্র
পাত
আগ্নেয়গিরি
অপসারী সীমানা
পাত
সামুদ্রিক খাত (অভিসারী সীমানা)
পাত
অগ্ন্যুদ্গম
স্থলভাগ
আগ্নেয় দ্বীপ
আগ্নেয় দ্বীপ
ম্যাগমার ঊর্ধ্বগমন
পাত
৭০ কিমি
২,৮০০ কিমি
গুরুমণ্ডল
পরিচলন কক্ষ
কেন্দ্র মণ্ডল

আগ্নেয়গিরির শ্রেনিবিভাগ

সক্রিয়তার ভিত্তিতে আগ্নেয়গিরি তিনধরনের হয়—

- সিসিলি দ্বীপের এটনা, লিপারি দ্বীপের স্ট্রম্বোলী, হাওয়াই দ্বীপের মৌনালোয়া, কিলাওয়া, ভারতের ব্যারেন— এই ধরনের আগ্নেয়গিরিগুলো সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে অবিরামভাবে অথবা প্রায়শই অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়ে চলেছে— এরা হলো সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ।

মৌনালোয়া

পারকুটিন

- জাপানের ফুজিয়ামা,

ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়া — এই ধরনের আগ্নেয়গিরি একবার অগ্ন্যুৎপাতের পর দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় থাকে। এরা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। এই ধরনের আগ্নেয়গিরিগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক। ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরি দুশো বছর পর হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ইন্দোনেশিয়ার তিনটে শহর ধ্বংস করে দেয়।

- মেক্সিকোর পারকুটিন, মায়ানমারের পোপো এই ধরনের আগ্নেয়গিরিগুলো অতি প্রাচীনকালে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা প্রায় নেই। এগুলো মৃত আগ্নেয়গিরি।

ভারতের ব্যারেন আগ্নেয়গিরিতে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের পর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে আবার অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে দেখা যায়।

➤ পৃথিবীর মানচিত্রে আগ্নেয়গিরিগুলোর অবস্থান দেখো।

অগ্ন্যুদগম : সহজ করে বুঝে নাও ...

একটা ছোটো ও একটা বড়ো কাঁচের পাত্র , ছোটো জাগ, কিছুটা পলিথিন, রাবার ব্যান্ড, পেনসিল আর রং লাগবে। প্রথমে ছোটো পাত্রটা গরম জল দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি করতে হবে। এবার ঐ জলে গাঢ় কোনও রং মিশিয়ে সাবধানে পলিথিন আর রাবার ব্যান্ডটা দিয়ে মুখটা আটকে দিতে হবে। পেনসিল দিয়ে পলিথিন-এর উপরে দু-তিনটে ছিদ্র করতে হবে। এরপর এই ছোটো পাত্রটা বড়ো পাত্রটার মধ্যে বসাতে হবে। বড়ো পাত্রটার মধ্যে জাগে করে এমনভাবে ঠান্ডা জল ঢালতে হবে যেন ছোটো পাত্রটা সম্পূর্ণ ডুবে যায়।

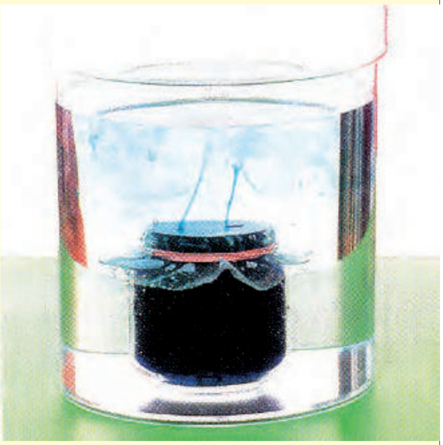

ছোটো পাত্র থেকে গরম রঙিন জল বেরিয়ে ওপরে উঠতে থাকবে।

— পুরো পরীক্ষাটার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করো।

‘আ আ’ আর ‘পা হো হো’ কি?

ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি থেকে গাঢ়, সান্দ্র একরকম

লাভা নির্গত হয়। হাওয়াই দ্বীপের ভাষায় এর নাম ‘আ আ’। এই লাভা দ্রুত খুব বেশিদূর প্রবাহিত হয় না।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরিগুলো থেকে অত্যন্ত পাতলা লাভা বেরিয়ে বহুদুর প্রবাহিত হয়।

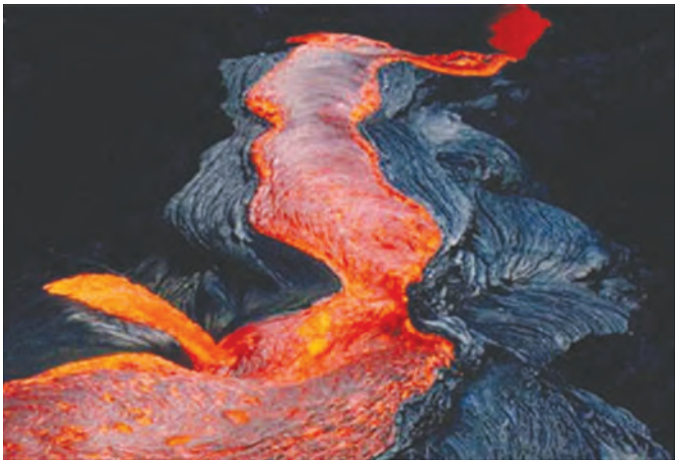

হাওয়াই দ্বীপের ভাষায় যার নাম ‘পা হো হো’। এই লাভা প্রবাহের ওপরের স্তর দ্রুত ঠান্ডা হয়ে কুঁচকে গিয়ে পাকানো দড়ির মতো দেখতে হয়।

বানিয়ে ফেলো তোমার আগ্নেয়গিরি —

একটা কার্ডবোর্ড, সরু লম্বা কৌটো, প্লাস্টিক টেপ, খবরের কাগজ, আঠা, বালি অথবা ছাই, রঙিন কাগজ, কিছুটা ভিনিগার আর খাবার সোডা গোলা জল লাগবে। কার্ডবোর্ডের মাঝখানে কৌটোটা টেপ দিয়ে আটকে দাও। কৌটোর চারদিক দিয়ে খবরের কাগজের দলা পাকিয়ে শঙ্কুর মতো তৈরি করো। এবার আগ্নেয়গিরির বাইরেটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল অথবা কোনো রঙিন কাগজ দিয়ে ঢেকে দাও। এর ওপর আঠা লাগিয়ে বালি ছড়িয়ে দিতে পারো।

তোমার আগ্নেয়গিরি মোটামুটি তৈরি। এবার অগ্ন্যুৎপাতের জন্য কৌটোর মধ্যে ভিনিগার আর খাবার সোডা গোলা জল ঢেলে দাও। কিছুটা লাল রং মিশিয়ে দিলেই দেখবে — তোমার আগ্নেয়গিরি থেকে লাল লাভা বেরিয়ে আসছে!

ভূমিকম্প (EARTHQUAKE)

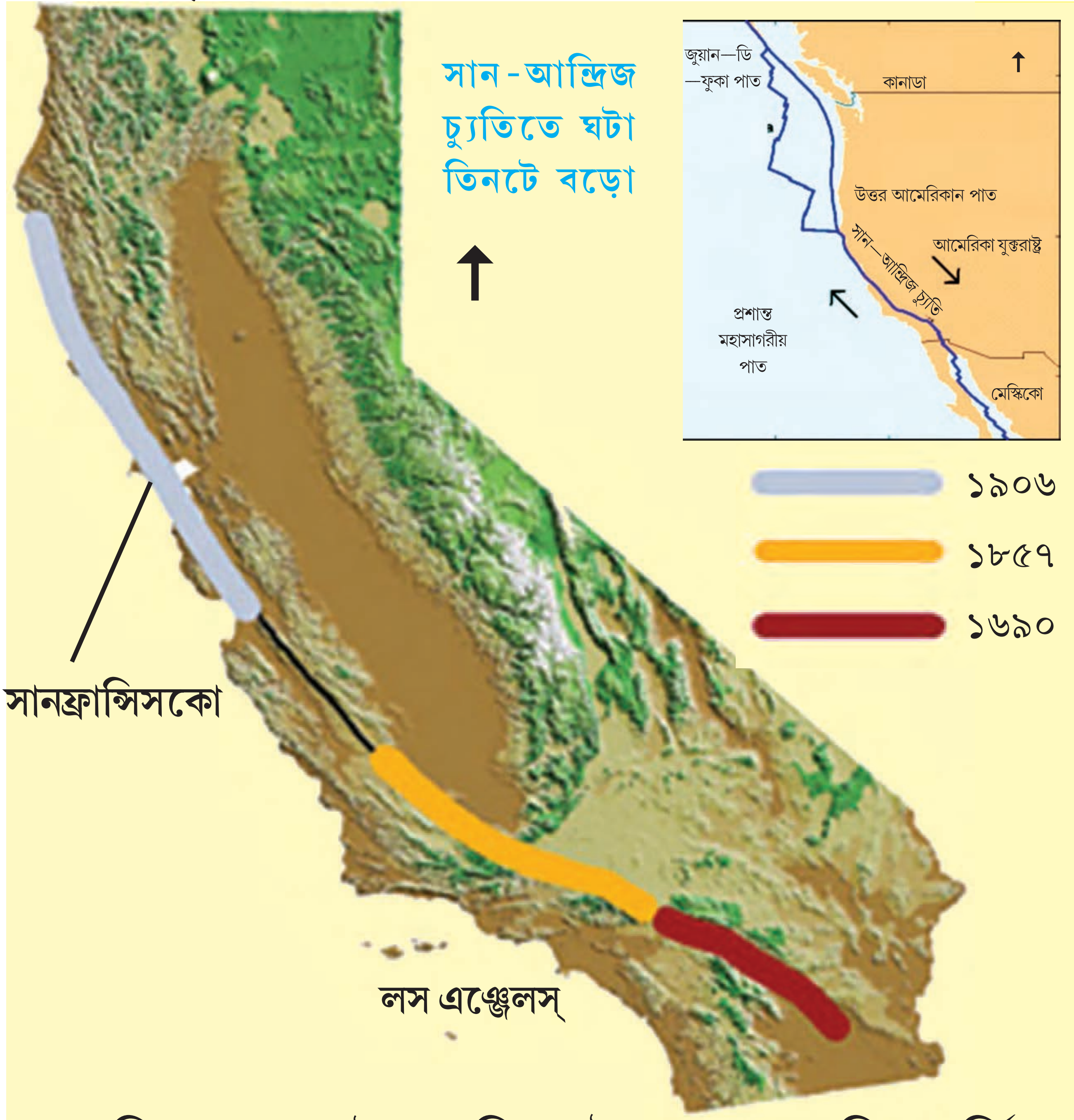

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকো— মনোরম জলবায়ুর এই শহর পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু এই শহরে বসবাস করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ।

সানফ্রান্সিসকো এবং লস এঞ্জেলস্ শহরদুটো San Andreas fault -এর প্রায় ওপরেই অবস্থিত। এই অঞ্চলে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত উত্তরে এবং উত্তর আমেরিকা পাত দক্ষিণে পাশাপাশি অগ্রসর হচ্ছে। ফলে সংলগ্ন অঞ্চলটা ভূগাঠনিকভাবে অত্যন্ত অস্থির। প্রায়শই ভূ-আলোড়ন, ভূমিকম্প ঘটতে থাকে। যেমন- ১৯০৬ সালের শক্তিশালী ভূমিকম্পে সানফ্রান্সিসকো শহর প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটা পাত সীমানা অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ। আর এজন্যই আগ্নেয়গিরি এবং ভূমিকম্পকেন্দ্র

গুলো প্রায়শই একই জায়গায় অবস্থিত হয়। তবে ভূআলোড়ন, পাতসঞ্চরণ, অগ্ন্যুৎপাত এর মতো প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও ভূগর্ভে গহ্বর, খনি ও সুড়ঙ্গ খনন, জলাধার নির্মাণ, ধস, বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি কৃত্রিম কারণেও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও কম্পিত হচ্ছে। পৃথিবীর স্থিতিস্থাপক অভ্যন্তরে কোনো সঞ্চিত শক্তি হঠাৎ মুক্ত হলে ভূত্বক কেঁপে ওঠে এবং ভূমিকম্প (Earthquake) হয়।

ভূপৃষ্ঠের নীচে ভূঅভ্যন্তরে যে স্থান থেকে ভূমিকম্পের উদ্ভব হয়, তা হলো ভূমিকম্পেরকেন্দ্র (Focus)। অধিকাংশ ভূমিকম্পের কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০-১০০ কিমি গভীরে হয়ে থাকে।

কেন্দ্র থেকে ঠিক উল্লম্ব দিকে ভূপৃষ্ঠের যে বিন্দুতে প্রথম কম্পন পৌঁছায় সেটা ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র (Epicentre)। পুকুরের মাঝে ঢিল ছুঁড়লে ঢেউগুলো যেমন বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তেমনি ভূমিকম্পের ফলে উদ্ভুত শক্তি কেন্দ্র, উপকেন্দ্র থেকে

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গগুলোকে বলা হয় ভূ-কম্পন তরঙ্গ (Seismic wave)। ভূ-কম্পন তরঙ্গ তিন ধরনের হয়। যথা—

- প্রাথমিক তরঙ্গ (Primary wave, 'P'wave)— সব থেকে দ্রুত (৬ কিমি/সে.) এই তরঙ্গ ভূ-পৃষ্ঠে প্রথম এসে পৌঁছোয়। কঠিন, তরল, গ্যাসীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে ক্রমসংকোচন ও প্রসারণ প্রক্রিয়ায় এই তরঙ্গ প্রবাহিত হয়।
- দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ (Secondary wave, 'S' wave)— P তরঙ্গের পরে এই তরঙ্গ (৩-৫ কিমি/সে.) ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছোয়। বস্তুকণার ওপর-নীচে ওঠানামার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। এই তরঙ্গ তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না। শুধুমাত্র কঠিন পদার্থের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়।

- ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র থেকে ভূ-পৃষ্ঠ বরাবর দুধরনের পৃষ্ঠ তরঙ্গ (Level wave, 'L' wave) ছড়িয়ে পড়ে (৩-৪ কিমি/সে.)। লাভ তরঙ্গ (Love wave) এবং র‍্যালে তরঙ্গ (Reyleigh wave)--- এই পৃষ্ঠ তরঙ্গগুলোর কারণেই বেশিরভাগ ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।

ভূমিকম্প তরঙ্গগুলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ সমীক্ষা করেই ভূ-অভ্যন্তরের গঠন বিন্যাস সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে।

প্রাথমিক তরঙ্গ

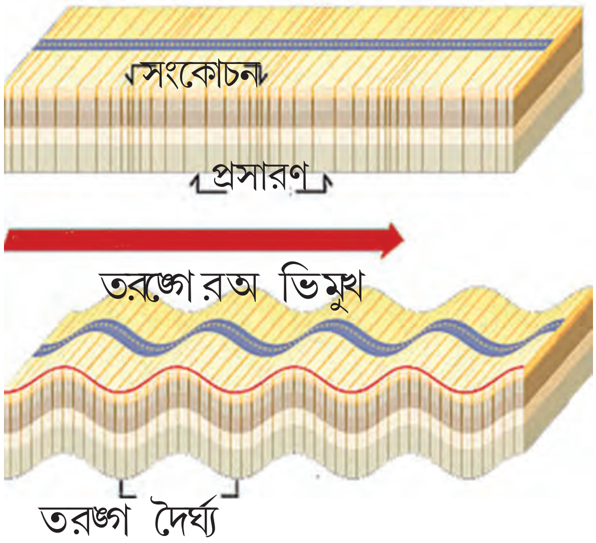

লাভ তরঙ্গ

দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ

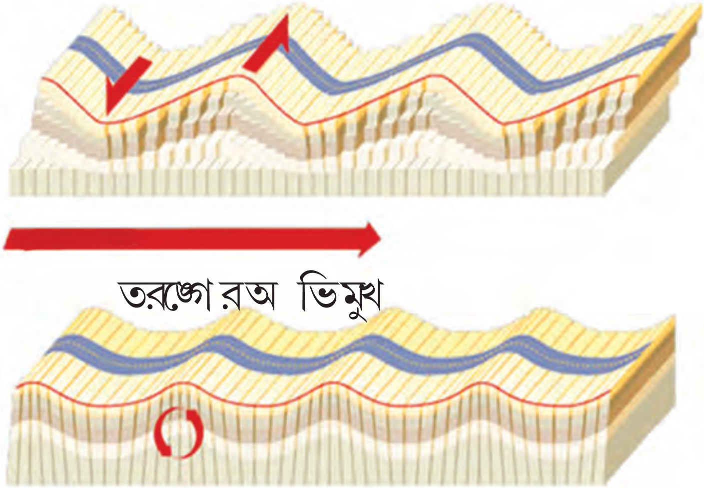

র‍্যালে তরঙ্গ

ভূমিকম্পের পরিমাপ

ভূমিকম্প সিসমোগ্রাফ (Seismograph) বা ভূকম্প-লিখ যন্ত্রে মাপা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রচুর ভূমিকম্প পরিমাপ কেন্দ্র আছে। কোনো ভূমিকম্পের কয়েক মিনিটের মধ্যেই একাধিক সিসমোগ্রাফ এর তথ্য তুলনা করে ভূমিকম্পের কেন্দ্র, উপকেন্দ্রের অবস্থান, স্থায়িত্ব, তীব্রতা — সবই নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যায়। ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি ও তীব্রতার মাত্রা পরিমাপ করা হয় রিখটার স্কেলে (Richter Scale)। চার্লস রিখটার উদ্ভাবিত এই স্কেলের সূচক মাত্রা ০–১০ ।প্রতিটি মাত্রার ভূমিকম্প তার আগের মাত্রার চেয়ে দশ গুণ বেশি শক্তিশালী হয়। রিখটার স্কেলে '৬' এর বেশি মাত্রার ভূমিকম্পে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১৯৬০ সালে চিলির ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৮.৫।

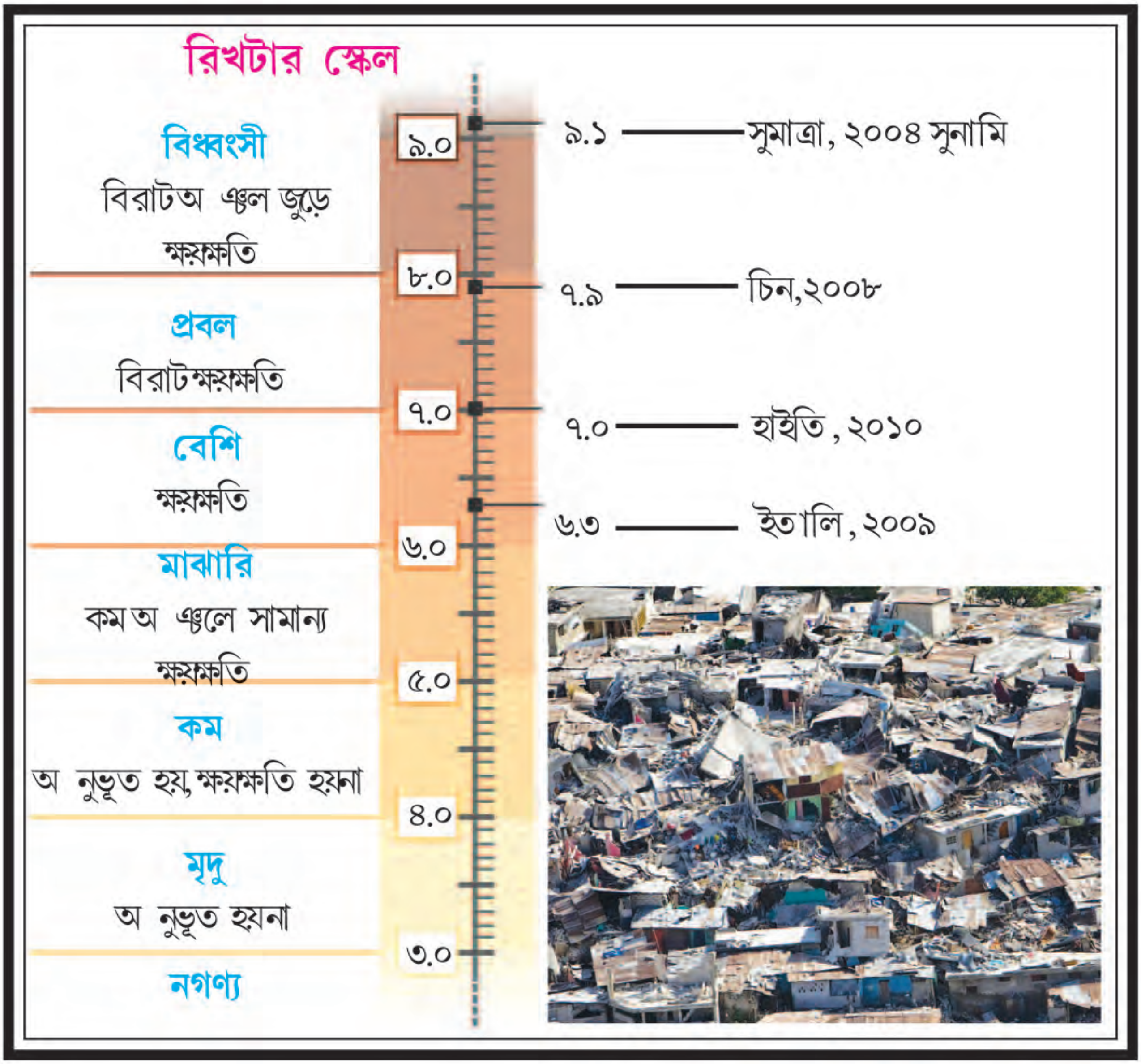

সব সিসমোগ্রাফের মূল গঠন এক। শক্ত ফ্রেম থেকে স্প্রিং এর সাহায্যে ভারী ওজন (Weight) ঝোলানো থাকে। এর সাথে পেন আটকানো থাকে। আর

একদিকে বেলনের গায়ে কাগজের রোল জড়ানো থাকে। ভূমিকম্পের সময় ওজনের সঙ্গে ঝোলানো পেন কাঁপতে থাকে। বেলনে আটকানো কাগজের গায়ে আঁকাবাঁকা ঢেউ-এর মত দাগ পড়ে, একে 'সিসমোগ্রাম' (Seismogram) বলে।

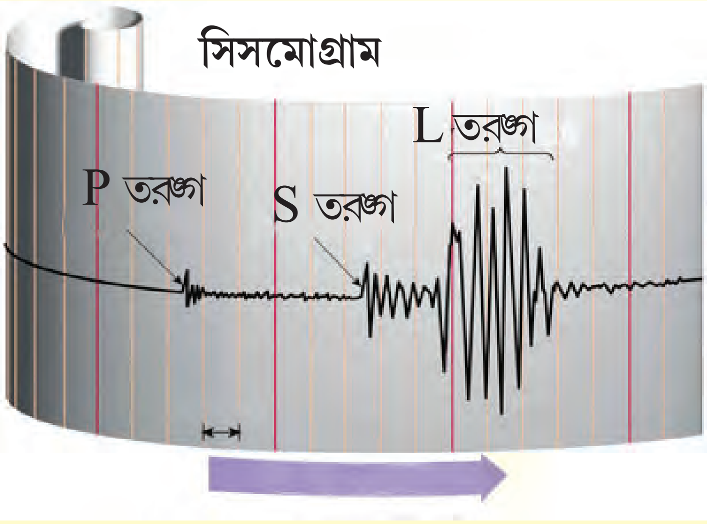

ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল

অভিসারী, অপসারী, নিরপেক্ষ সমস্ত ধরনের পাত সীমানায় ভূমিকম্প হলেও অভিসারী পাত সীমানায় তীব্র ভূমিকম্প হয়ে থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিমজ্জিত পাত সীমানায়, হিমালয় ও আল্পস পার্বত্য অঞ্চলে অভিসারী সংঘর্ষ সীমানায় প্রায়শই ভূমিকম্প হয়। পৃথিবীর সমস্ত নবীন ভঙ্গিল পার্বত্য অঞ্চল ভূমিকম্পপ্রবণ।

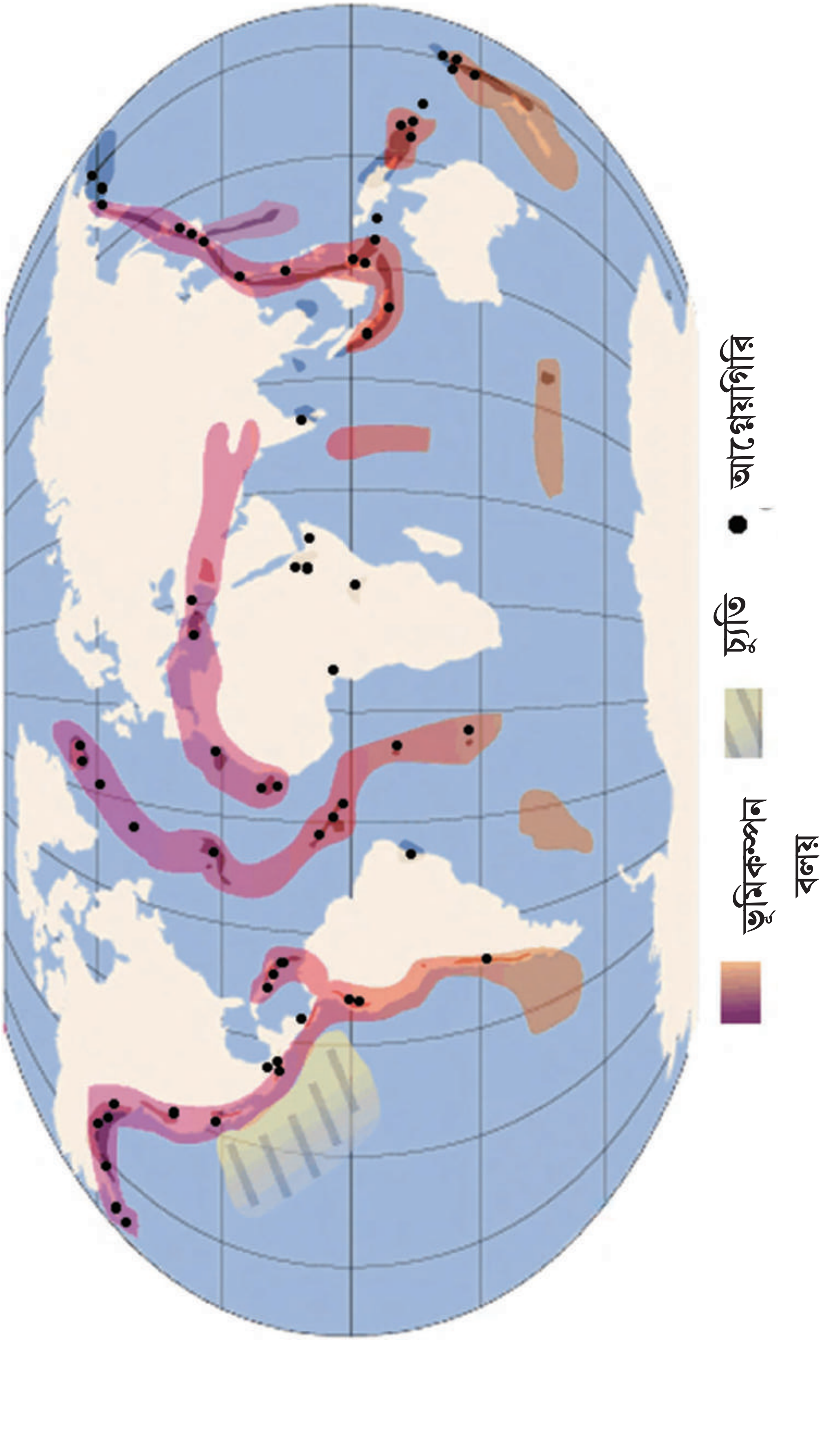
ভূমিকম্পন বলয়
চ্যুতি
আগ্নেয়গিরি

মানচিত্রে পৃথিবীর প্রধান আগ্নেয়গিরি এবং ভূমিকম্প বলয়গুলো ভালো করে লক্ষ করো—

● পৃথিবীর অধিকাংশ জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, প্রশান্ত মহাসাগরকে বলয়ের মতো ঘিরে রেখেছে। এজন্য প্রশান্ত মহাসাগরের দুদিকের উপকূলের আগ্নেয়গিরি বলয়কে 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় অগ্নিবলয়' (Pacific Ring of

Fire) বলা হয়। পৃথিবীর ৭০ শতাংশ ভূমিকম্প হয় এই বলয়ে।

—এই বলয়ের প্রধান আগ্নেয়গিরিগুলো মানচিত্রে শনাক্ত করো—ফুজিয়ামা (জাপান), পিনাটুবো (ফিলিপাইনস), ক্রাকাতোয়া (ইন্দোনেশিয়া), সেন্ট হেলেন্স (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র), পোপোক্যাটিপেটল্ (মেক্সিকো), কোটোপ্যাক্সি (ইকুয়েডর)।

- মেক্সিকো থেকে শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর, আল্পস, ককেশাশ, হিমালয় হয়ে বিস্তৃত মধ্য পৃথিবীর পার্বত্য বলয় অথবা মধ্য মহাদেশীয় বলয়-এ পৃথিবীর ২০ শতাংশ ভূমিকম্প ঘটে। ইতালির ভিসুভিয়াস, সিসিলির স্ট্রম্বলি, এটনা প্রভৃতি আগ্নেয়গিরি এই বলয়ের অন্তর্গত।

আমাদের দেশের কোন অঞ্চল কতটা ভূমিকম্পপ্রবণ জেনে নাও

ভারতের তিনভাগের দুভাগ অঞ্চলই ভূমিকম্প প্রবণ। ভূমিকম্প প্রবণতার বিচারে ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। ভারতের ভূমিকম্প বলয় প্রধানত হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিস্তৃত। তবে শেষ পঞ্চাশ বছরে দাক্ষিণাত্য মালভূমিতেও ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে।

- শ্রেণিকক্ষে এই পাঁচটা ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করো। ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে মিলিয়ে দেখো— কোন অঞ্চলে কোন কোন বড়ো শহর, বিখ্যাত স্থান রয়েছে?
- তুমি যেখানে বাস করো সেটা কোন ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত? সেখানে কখনো ভূমিকম্প হয়েছে?

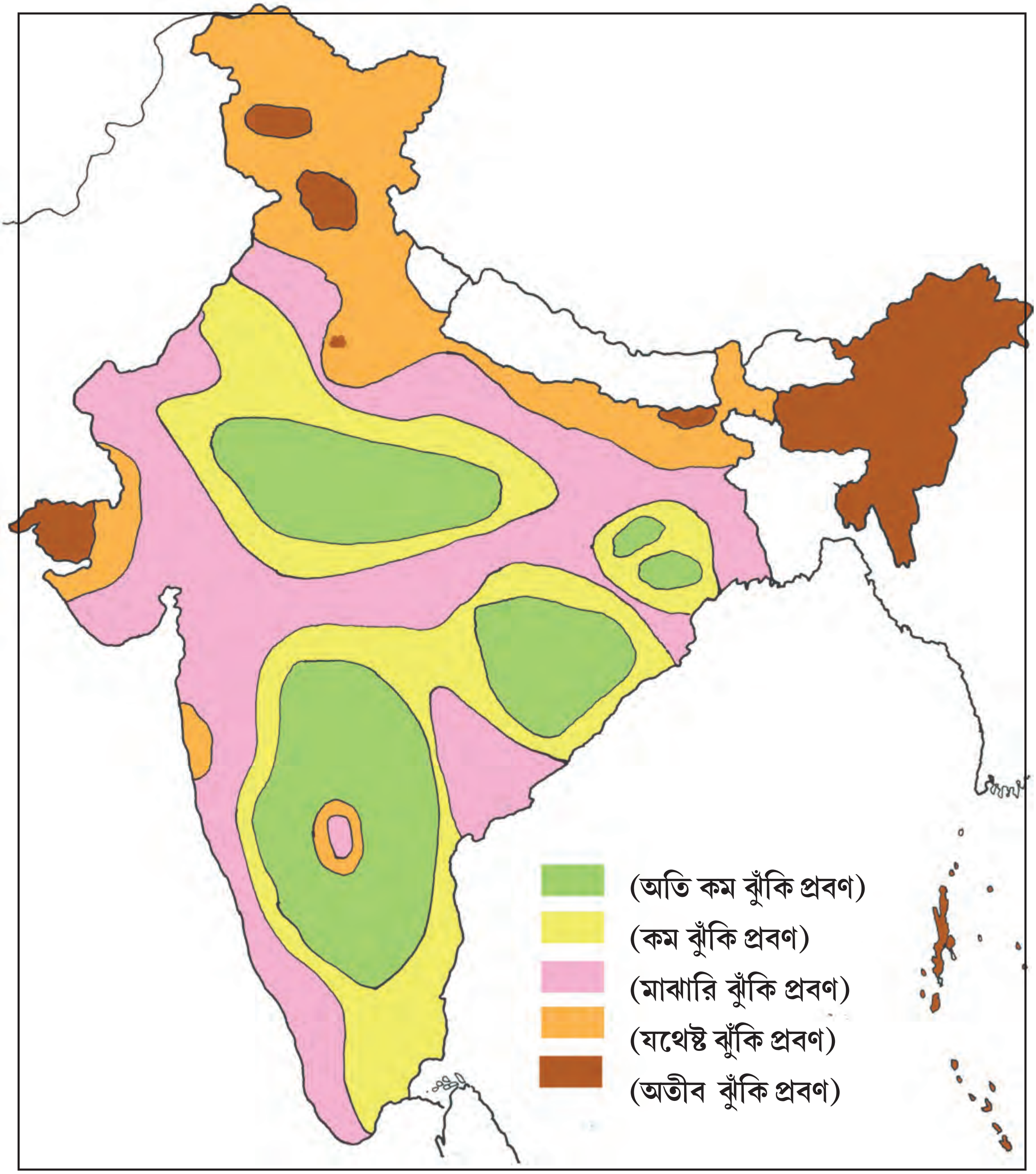

ভারতের ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল

অগ্ন্যুদ্‌গম, ভূমিকম্প : প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মানুষের জীবন

অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমিকম্প — দুটোই ভূঅভ্যন্তরীণ শক্তির আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ। এর ফলে একদিকে যেমন পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি, জলবায়ুর বড়ো ধরনের পরিবর্তন হতে পারে, সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে বিপর্যয় ঘটতে পারে। আবার পৃথিবীর অনেক আগ্নেয়গিরি সংলগ্ন অঞ্চল অত্যন্ত জনবহুল। আগ্নেয় ভস্ম, লাভা থেকে উর্বর মাটি তৈরি হয়, যা কৃষিকাজে খুবই উপযুক্ত। যেমন— ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমির উর্বর কৃষ্ণ মৃত্তিকা (Black soil)। আগ্নেয়গিরি অধ্যুষিত অঞ্চলে উষ্ণপ্রস্রবণ, গাইজার থেকে অনেকসময় মূল্যবান রত্ন, খনিজ পাওয়া যায় (দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বারলির হিরের খনি অঞ্চল)।

শক্তিশালী ভূমিকম্পে ইরানে মৃত ৪০

...ন ১২ জনের মৃত্যু, কম্পন অনুভূত প্রায় সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায়

কম্পন-কথা

ভূমিকম্পের কেন্দ্র: ইরানের খাস শহরের ৮৬ কিমি পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে

রিখটার স্কেলে তীব্রতা: ৭.৮

কেন্দ্রের গভীরতা: ১৫.২ কিলোমিটার

কখন ভূকম্পন: বিকেল ৩...

কী কারণে কম্পন: এই অং...

জের উত্তর ভারতেও

নয়াদিল্লি: ইরানের ভূমিকম্পের জেরে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ ও রাজধানীর আশপাশে বেশ ভালো রকমের কম্পন হয়েছে। প্রায় ৪৫ সেকেন্ড ধরে...

রাশিয়ায় ভূমিকম্প

মস্কো: মঙ্গলবার ভোরে কেঁপে উঠ... ভূমিকম্প-প্রবণ...

জাগছে ঘুমন্ত দৈত্য

উঠছে ধোঁয়া মেক্সিকো সিটির অদূরে অবস্থিত পোপোক্যাটাপেট্‌ল আ... পাহাড়ের জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া ও ছাই। দৃশ্যমানতা...

সুনামি, আতঙ্ক ফুকুশিমায়

দক্ষিণ মেরুর গভীরে ফুঁসছে আগ্নেয়গিরি

কাঁপল কলকাতা, উৎস খুবই কাছে

ভরসাজেয়

ভূকম্পে কেঁপে উঠল মহানগর। তবে তার তীব্রতা ছিল সামান্যই। স্থায়িত্ব ছিল মাত্র এক সেকেন্ড। তবে এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল কলকাতার কাছেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনে। শনিবার রাত পর্যন্ত ভূমিকম্পের জেরে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি।

কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৫৮ মিনিটে কেঁপে ওঠে কলকাতা ও তার আশপাশের এলাকা। রিখটার স্কেলে তার তীব্রতা ছিল ৩.৬। ভূমিকম্পটির উৎসস্থল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৮ কিলোমিটার গভীরে। ভরসাজেয় এমন কম্পনে...

লাভাস্রোতে

- অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো ভূমিকম্পের আগাম সতর্কবার্তা দিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানোর কোনো সুযোগ থাকে না। তাই আকস্মিক ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি ভেঙে, চাপা পড়ে প্রচুর প্রাণহানি হয়। বড়ো বড়ো ধস, ফাটল তৈরি হওয়ায় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। বড়ো জলাধারের চাপে ভূমিকম্প হলে (মহারাষ্ট্রের কয়না জলাধার) বাঁধ ভেঙে জলাধারের জল বেরিয়ে গিয়ে সংলগ্ন অঞ্চলে হঠাৎ বন্যা হয়।

  সমুদ্র তলদেশে বা উপকূল অঞ্চলে ভূমিকম্পের ফলে ঢেউ-এর উচ্চতা বেড়ে প্রবল শক্তিতে উপকূল অঞ্চলে আছড়ে পড়ে (সুনামি)। এর ফলে বহু জীবনহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়।

- পৃথিবীব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে বহুতল, রাস্তাঘাট, বাঁধ,

সুনামি

জলাধার নির্মাণ, অবৈধ খনি খনন — সবই সম্ভাব্য বিপর্যয়ের প্রবণতাকে বাড়িয়ে তুলছে।

- ভূমিকম্পের ফলে কখনও কখনও উপকূল অঞ্চলে ভূভাগ নিমজ্জিত হয়ে প্রাকৃতিক বন্দর তৈরি হয়। বহু আন্তঃসাগরীয় এলাকা ভেসে উঠে নতুন 'ভূভাগ' তৈরি হয় (সাম্প্রতিক করাচির কাছে জেগে ওঠা 'কাদার দ্বীপ')।

- ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ-এর কাছে ভারত মহাসাগরের নীচে রিখটার স্কেলে ৮.৯ মাত্রায় ভূমিকম্পে এবং ভয়ংকর

জলোচ্ছ্বাসে (সুনামি) ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১ টা দেশে বহু ক্ষয়ক্ষতি ও ৩,০০,০০০ মানুষের প্রাণহানি হয়।

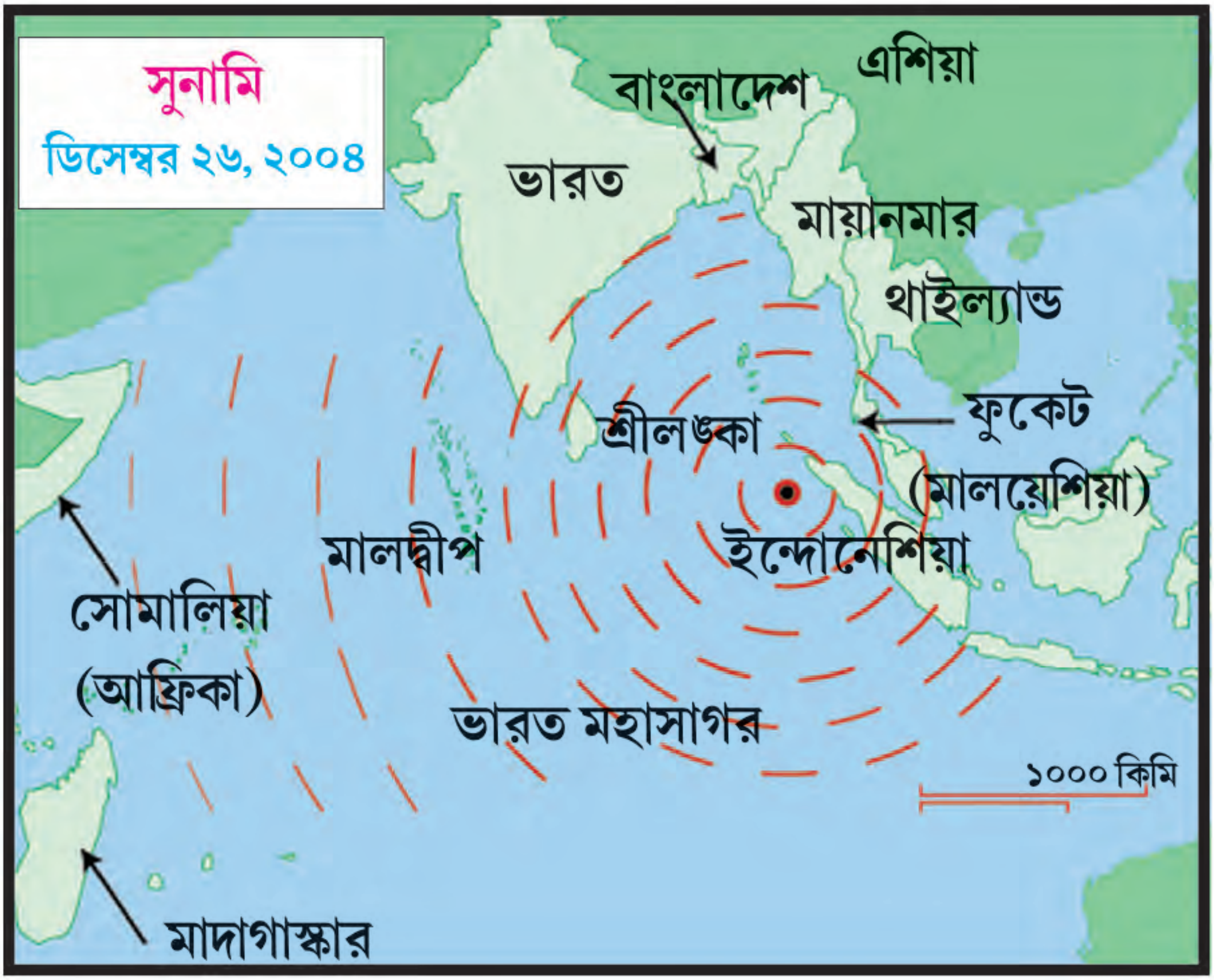

পূর্বাভাস ও প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। কিন্তু কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা প্রচুর জীবনহানি

ভূকম্প প্রতিরোধী নির্মাণ

আটকাতে পারে। যেমন--- ভূকম্প প্রতিরোধী নির্মাণ, আপৎকালীন প্রস্তুতি, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা। অনেক সময় আমাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তন, জীবজন্তুদের অস্বাভাবিক আচরণ, ভূমিকম্প সম্পর্কে আগাম বার্তা দিতে পারে।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা

- বাড়ির ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো চিহ্নিতকরণ
- দুর্যোগ মোকাবিলার পরিকল্পনা
- জরুরিকালীন জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা

- বাড়ির দুর্বল স্থান মেরামত করা
- ভূমিকম্প চলাকালীন কোন শক্ত আসবাবের তলায় আশ্রয় নেওয়া
- কম্পন থেমে গেলে আঘাত, ক্ষয়ক্ষতির অনুসন্ধান
- বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা অনুসরণ

মনে করো এই মুহূর্তে হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হলো। এরকম পরিস্থিতিতে তুমি প্রথমেই কী করবে ?

- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ী বা স্কুল থেকে বেরিয়ে কোনো খোলা জায়গায় যাবে।

- যদি খোলা জায়গায় বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয় তবে বাড়ির মধ্যে দ্রুত কোনো টেবিল বা শক্ত আসবাবের তলায় ঢুকে পড়বে।
- ভূমিকম্প চলাকালীন বহুতল বাড়ির ঝুল বারান্দা, সিঁড়ি, লিফ্‌ট ব্যবহার এড়িয়ে চলবে।
- বাড়ি থেকে বেরবার আগে সম্ভব হলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে নেবে।

শিলা

তন্ময় পুজোর ছুটিতে হিমাচল প্রদেশের মানালিতে বেড়াতে গিয়েছিল। ওখানে বিয়াস নদীর ধারে নানা ধরনের পাথর দেখতে পায়। তার অনেকগুলো তন্ময় বাড়ি নিয়ে আসে। ওগুলো শিলা আর খনিজ। আমাদের চারপাশের পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, সমুদ্রেরপাড়, মালভূমি সবই এই শিলা দিয়ে গঠিত।

পৃথিবী যে শক্ত আবরণে ঢাকা তা হলো শিলা। শিলা (Rock) আসলে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত এক বা একাধিক খনিজের সমসত্ত্ব বা অসমসত্ত্ব মিশ্রণ। আর যে খনিজ (Mineral) দিয়ে শিলা গঠিত তা হলো এক বা একাধিক অজৈব মৌলিক পদার্থের যৌগ। যেমন গ্রানাইট শিলা কোয়ার্টজ, ফেল্ডসপার, মাইকা ও হর্নব্লেন্ড খনিজ দ্বারা গঠিত। আবার চুনাপাথর শুধুমাত্র ক্যালসাইট অথবা অ্যারাগোনাইট খনিজ দিয়ে গঠিত।

♦ প্রকৃতিতে বিভিন্ন রকমের শিলা দেখতে পাওয়া যায়। এদের সৃষ্টি আর বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে শিলাকে তিনটি পরিবারে ভাগ করা যায় — (১) আগ্নেয় শিলা, (২) পাললিক শিলা ও (৩) রূপান্তরিত শিলা

জেনে রাখো

- **সমসত্ত্ব মিশ্রণে** উপাদানগুলো সব জায়গায় সম অনুপাতে থাকে। **অসমসত্ত্ব মিশ্রণে** উপাদানগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অনুপাতে থাকে।
- শিলার প্রবেশ্যতা বলতে শিলার মধ্যে দিয়ে তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের প্রবেশ করার ক্ষমতাকে বোঝায়। সছিদ্রতা হলো শিলার মধ্যেকার শূন্যস্থান এবং শিলার মোট আয়তনের অনুপাত। প্রবেশ্যতা বেশি হলে জলধারণ ক্ষমতা কমে। সছিদ্রতা বেশি হলে জলধারণ ক্ষমতা বাড়ে ।

আগ্নেয় শিলা

পৃথিবী সৃষ্টির সময় উত্তপ্ত ও তরল অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করে ভূত্বকের মধ্যে ও ওপরে প্রথম যে কঠিন শিলার সৃষ্টি হয় সেটি আগ্নেয় শিলা (Igneous Rock)। পৃথিবীতে প্রথম সৃষ্টি হওয়ায় এই শিলার আরেক নাম প্রাথমিক শিলা। ভূ-অভ্যন্তরের বিভিন্ন ধাতব পদার্থ যেমন-সিলিকন, লোহা, নিকেল, ম্যাগনেশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি উত্তপ্ত ও গলিত অবস্থায় ম্যাগমা রূপে থাকে। এই ম্যাগমা ভূ-অভ্যন্তরের প্রবল চাপে লাভা রূপে ভূপৃষ্ঠে উঠে এসে বা ভূ-অভ্যন্তরেই ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়ে জমাট বেঁধে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি করে।

উৎপত্তি অনুসারে আগ্নেয় শিলা দুরকম। ভূ-অভ্যন্তরের অত্যধিক চাপে উত্তপ্ত গলিত ম্যাগমা ভূত্বকের কোনো

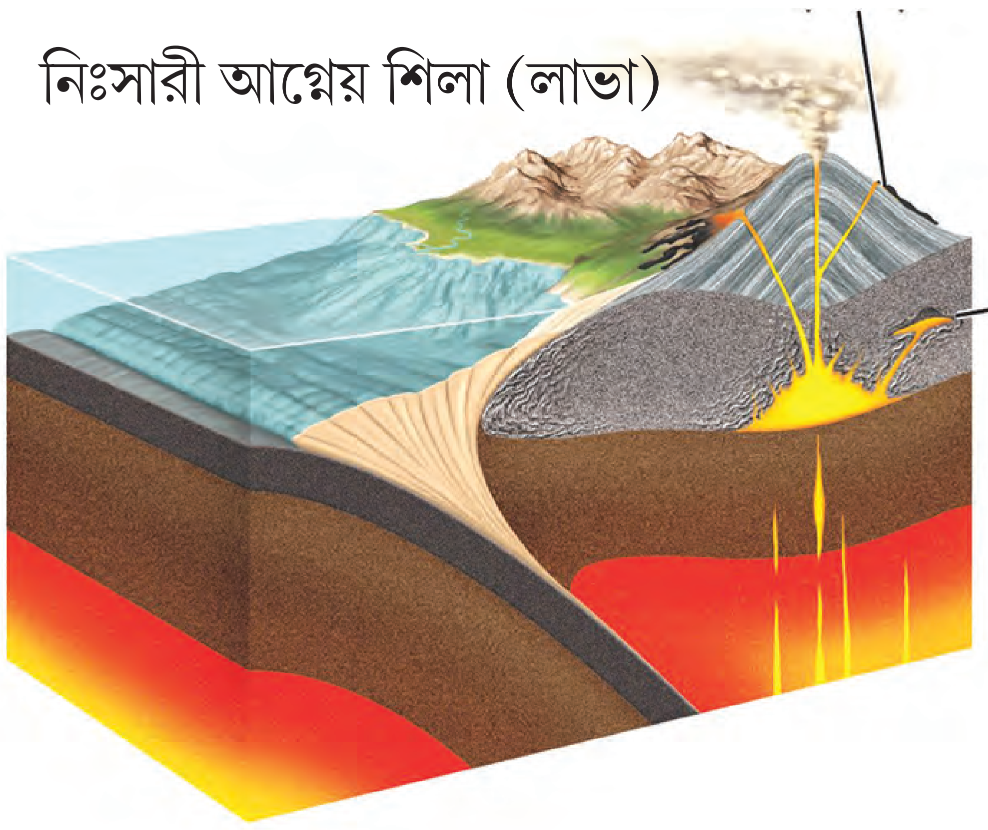

দুর্বল ফাটলের মধ্যে দিয়ে ভূপৃষ্ঠে লাভা রূপে এসে শীতল ও কঠিন হয়ে যে আগ্নেয় শিলা সৃষ্টি করে তার নাম নিঃসারী আগ্নেয় শিলা। খুব দ্রুত জমাট বেঁধে গঠিত হয় বলে এর দানাগুলো বেশ সূক্ষ্ম হয়। যেমন— ব্যাসল্ট, অবসিডিয়ান।

আবার ভূ-অভ্যন্তরের গলিত ম্যাগমা ভূত্বকের দুর্বল ফাটল বা ছিদ্রের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছোতে না পেরে ভূ-অভ্যন্তরেই

ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়ে উদ্‌বেধী আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি করে। যেমন—গ্রানাইট, ডোলেরাইট। এই উদ্‌বেধী আগ্নেয় শিলা আবার দুরকমের হয়। ম্যাগমা ভূ-অভ্যন্তরের কোনো ফাটল বা ছিদ্রপথে ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়ে জমাট বেঁধে সৃষ্টি করে উপপাতালিক শিলা। যেমন—ডোলেরাইট। আবার ম্যাগমা ভূ-অভ্যন্তরের একেবারে তলদেশে অতি ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়ে সৃষ্টি করে পাতালিক শিলা। ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়ে জমাট বাঁধে বলে এই শিলার দানাগুলো কিছুটা স্থূল হয়। যেমন— গ্রানাইট।

আগ্নেয় শিলার বিশেষত্ব

- এই শিলা শক্ত ও ভারী, ঘনত্ব খুব বেশি।
- কেলাসের মতো গঠন দেখা যায়।

- এই শিলায় উল্লম্ব দারণ (Joint) ও ফাটল (Crack) দেখা যায়, তাই প্রবেশ্যতা বেশি।
- ভঙ্গুরতা যথেষ্ট কম হওয়ায় ক্ষয় প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশি।

ব্যাসল্টের উল্লম্ব দারণ

বিশেষ কথা

বিভিন্ন খনিজের সাথে দৃঢ় ভাবে জলের অণু সংযুক্ত হয়ে কেলাস গঠন করে, যা দেখতে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। এই কেলাসের মধ্যে পরমাণুগুলো যে নির্দিষ্ট বিন্যাসে অবস্থান করে তা অনেকটা ছবিতে দেখানো

কমলালেবুগুলোর মতো। সাধারণত আগ্নেয় শিলা সৃষ্টির সময় তার মধ্যে খনিজের সাথে জল থেকে যায় যা শিলার মধ্যে শিরার মতো অবস্থান করে। শিলা ঠান্ডা হলে ঐ শিরার আকারে থাকা খনিজ জল বাষ্পীভূত হয় এবং কেলাস গঠিত হয়। কোয়ার্টজ, টোপ্যাজ, ক্যালসাইট, হিরে— এই সব খনিজগুলোতে কেলাসের গঠন ভালো ভাবে দেখা যায়।

ক্যালসাইটের কেলাস

কেলাসের গঠন চিনির দানা বা মিছরির টুকরোর মতো দেখতে হয়।

দুটি আগ্নেয় শিলার পরিচয়

গ্রানাইট : প্রধানত এই আগ্নেয়শিলায় মহাদেশীয় ভূত্বক তৈরি। হালকা সাদা, ধূসর থেকে গোলাপি রঙের এই শিলা কোয়ার্টজ, ফেল্ডসপার, মাইকা ও হর্নব্লেন্ড খনিজ দ্বারা গঠিত। এই শিলা অপ্রবেশ্য। খুব ভারী এবং শক্ত হওয়ায় গ্রানাইটের ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব বেশি। ভূ-অভ্যন্তরে অতি ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়ে জমাট বাঁধায় এই শিলার দানাগুলো কিছুটা বড়ো (ব্যাস ৩ মিমি-এর বেশি)। গ্রানাইট শিলায় গঠিত অঞ্চলের ভূমিরূপ সাধারণত গোলাকার হয়।

ব্যাসল্ট : প্রধানত এই আগ্নেয় শিলায় মহাসাগরীয় ভূত্বক গঠিত। খুব ভারী ও শক্ত, ক্ষয় প্রতিরোধী এই শিলা গাঢ় ধূসর থেকে কালো রঙের হয়। ব্যাসল্ট গঠনকারী প্রধান খনিজগুলি হলো কোয়ার্টজ, ফেল্ডসপার, অলিভিন ও পাইরক্সিন। ব্যাসল্ট শিলায় উল্লম্ব দারণ ও ফাটলের সংখ্যা খুব বেশি থাকায় এর প্রবেশ্যতা যথেষ্ট বেশি। খুব দ্রুত জমাট বেঁধে গঠিত হওয়ায় এর দানাগুলো বেশ সূক্ষ্ম (ব্যাস ১ মিমি-এর কম)। ব্যাসল্ট শিলা গঠিত অঞ্চলে চ্যাপ্টা আকৃতির ভূমিরূপ দেখা যায়।

পায়েল পুরিতে বেড়াতে গিয়েছিল। সমুদ্রের সামনে শুধু বালি আর বালি। বালি শুকনো থাকলে অনেক ঝুরঝুরে আর হালকা লাগে, কিন্তু জলে ভিজলেই ভারী হয়ে ওঠে। পায়েল তার বাবার কাছ থেকে জানতে পারে এই বালি আসলে শিলার ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ, যা সমুদ্রের ঢেউ-এর মাধ্যমে পাড়ে এসে জমা হয়।

পাললিক শিলা

আগ্নেয় শিলা বহু দিন ধরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ক্ষয়কারী শক্তি যেমন—নদী, হিমবাহ, বায়ু, সমুদ্রতরঙ্গ প্রভৃতির প্রভাবে উৎস স্থান থেকে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত ও পরিবাহিত হয়ে কোনো সমুদ্র, হ্রদ বা নদীর তলদেশে জমা হতে থাকে। এভাবে বছরের পর বছর ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলো স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় এবং চাপের ফলে জমাট

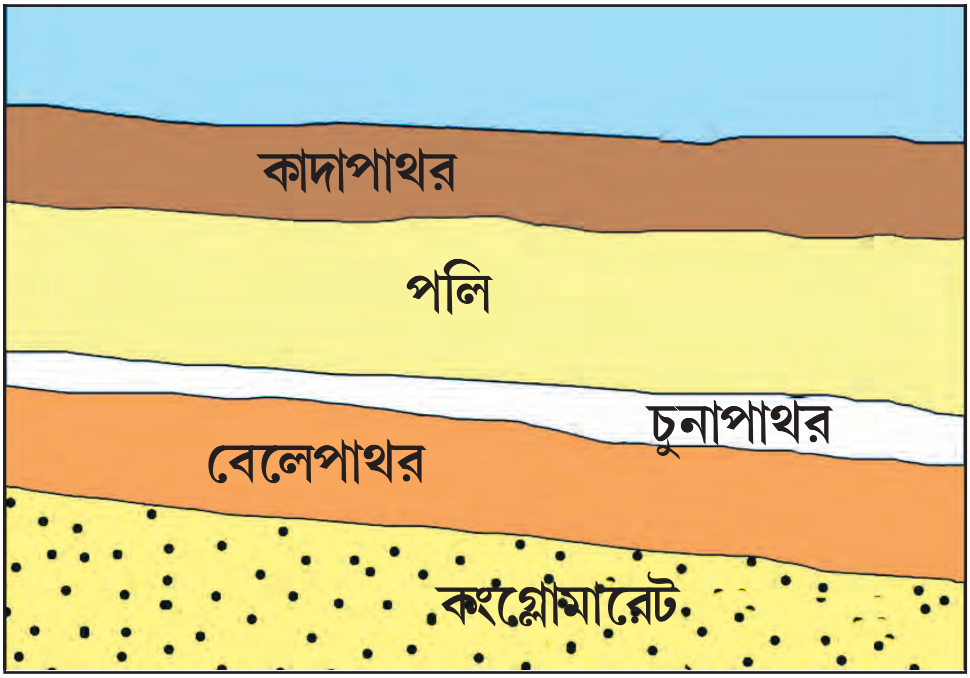

বেঁধে শক্ত হয়ে পাললিক শিলার সৃষ্টি করে। এই শিলার মধ্যে বালি, পলি ও কাদার ভাগ বেশি থাকে।

পলি জমাট বেঁধে সৃষ্টি হওয়ায় এর নাম পাললিক শিলা (Sedimentary Rock)। যেমন— চুনাপাথর, বেলেপাথর, কাদাপাথর।

পাললিক শিলার বিশেষত্ব

- এই শিলায় স্তরায়ণ এবং কাদার চিড় খাওয়া দাগ লক্ষ করা যায়।
- একমাত্র এই শিলাতেই জীবাশ্ম দেখা যায়।
- এই শিলায় সছিদ্রতা ও ভঙ্গুরতা দেখা যায়।
- এই শিলার প্রবেশ্যতা খুব বেশি।

- ক্ষয় প্রতিরোধের ক্ষমতা বিভিন্ন রকম হয়।
- কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার এই শিলা।
- কাঠিন্য আগ্নেয় শিলার থেকে কম; দারণ, ফাটল বা কেলাসের গঠন থাকে না।

পাললিক শিলার অপরিহার্যতা : প্রায় ৩০-৩৫ কোটি বছর আগে ভূ-আন্দোলনের সময় পৃথিবীর অরণ্য ভূগর্ভে চাপা পড়ে যায় এবং ভূগর্ভের চাপ ও তাপে উদ্ভিদের কাণ্ডে সঞ্চিত কার্বন স্তরীভূত হয়ে কয়লায় পরিণত হয়।

প্রায় ৭-১০ কোটি বছর আগে পাললিক শিলাস্তরে নানাধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ চাপা পড়ে যায়। ওপরের স্তরের প্রবল চাপে ও ভূগর্ভের প্রচণ্ড

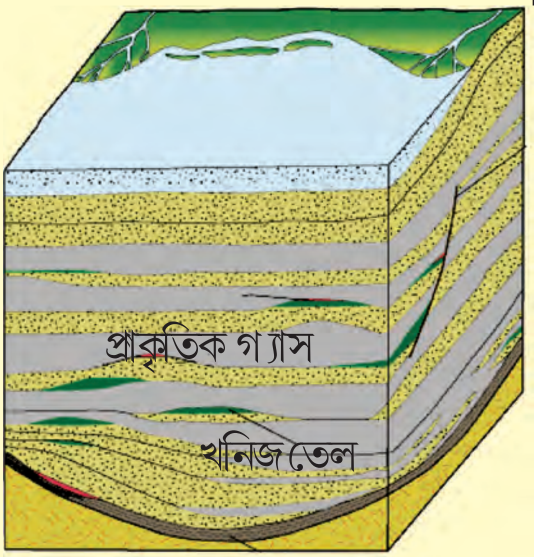

তাপে তাদের দেহাবশেষ হাইড্রোজেন ও কার্বনের দ্রবণে পরিণত হয়ে খনিজ তেলের সৃষ্টি হয়। খনিজ তেলের ওপরের স্তরে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপস্থিতি দেখা যায়। শুধুমাত্র সছিদ্র পাললিক শিলাস্তরেই খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়।

অতীতের ছাপ—জীবাশ্ম

স্তরে স্তরে জমাট বেঁধে পাললিক শিলা সৃষ্টির সময় কখনো কখনো সামুদ্রিক উদ্ভিদ বা প্রাণী তার মধ্যে চাপা পড়ে যায়। পরে পাললিক শিলার মধ্যে ওই উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ প্রস্তরীভূত হলে তাদের দেহাবশেষের ছাপ থেকে যায়। একে বলে **জীবাশ্ম (Fossil)**।

পলির উৎপত্তি অনুসারে পাললিক শিলা দু প্রকার

সংঘাত শিলা — প্রাচীন শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বহুদিন ধরে জমাট বেঁধে যে শিলার সৃষ্টি করে তা হলো সংঘাত শিলা। যেমন --- কংগ্লোমারেট, ব্রেকসিয়া।

অসংঘাত শিলা — রাসায়নিক উপায়ে অথবা জৈবিক উপায়ে সৃষ্ট শিলা হলো অসংঘাত শিলা। যেমন--- চুনাপাথর, লবণ শিলা।

যান্ত্রিক উপায়ে গঠিত পাললিক শিলা তিন প্রকার

কাদাপাথর

কর্দমময় (০.০৬ মিমি-এর কম ব্যাসযুক্ত দানা)

বেলেপাথর

বালুকাময় (০.০৬ - ২ মিমি পর্যন্ত ব্যাসযুক্ত দানা)

কংগ্লোমারেট

প্রস্তরময় (২ মিমি-এর বেশি ব্যাসযুক্ত দানা)

তিনটি পাললিক শিলার পরিচয়

চুনাপাথর: চুনাপাথর বা ক্যালশিয়াম কার্বনেট বিশুদ্ধ জলে দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু বৃষ্টির জল বা অ্যাসিড মিশ্রিত জলে দ্রুত দ্রবীভূত হয় এবং ক্যালশিয়াম বাইকার্বনেট-এ পরিণত হয়। এর ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশ কম এবং প্রবেশ্যতা বেশি। চুনাপাথর যুক্ত অঞ্চলে বৃষ্টির জলে দ্রুত গর্ত সৃষ্টি হয় এবং জল নীচে নেমে যায়। চুনাপাথরের রং সাদা, ধূসর, সবুজ, কালচে হতে পারে। সিমেন্ট তৈরিতে, লৌহ ইস্পাত শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়।

বেলেপাথর: বেলেপাথরের প্রবেশ্যতা বেশি হলেও ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি। বেলেপাথর হলুদ, কমলা, লাল, গোলাপি, সাদা, ধূসর হতে পারে। বেলেপাথর গঠিত অঞ্চলের মৃত্তিকা লবণাক্ত ও এর উর্বরতা কম। স্থাপত্য, স্মৃতিসৌধ এই পাথরে নির্মিত

হয়। লালকেল্লা, উদয়গিরি - খণ্ডগিরির মন্দির, খাজুরাহোর মন্দির, জয়সলমীরের সোনার কেল্লা বেলেপাথরে তৈরি।

কাদাপাথর: কাদাপাথরের রং কালচে ধূসর। কাদাপাথরের মধ্যে স্তরায়ন খুব স্পষ্ট। এটি মিহি দানাযুক্ত শিলার উদাহারণ। এর সছিদ্রতা খুব বেশি। কাদাপাথর বেশ নরম ও ভঙ্গুর প্রকৃতির। এই শিলাকে পাতলা স্তরে ভাঙা যায় বলে বাড়ির টালি তৈরিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। খুব সহজেই স্তর বরাবর ভেঙে যায় বলে এই শিলায় গঠিত অঞ্চলে বড়ো ধরনের নির্মাণকার্য করা উচিত নয়।

সন্দীপ শীতকালে দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি ঘুরতে গিয়েছিল। আগ্রার তাজমহল দেখে সন্দীপের ভীষণ ভালো লেগেছিল। সন্দীপের মা বলেছিলেন, ‘তাজমহলের পাথরগুলোর সাথে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাথরের কোনো মিল

খুঁজে পাচ্ছো?' সন্দীপ বলেছিল, 'পাথরগুলো অনেকটাই একরকম দেখতে। কিন্তু এগুলো কী পাথর?' মা বলেছিলেন 'এগুলো সবই মার্বেল।'

রূপান্তরিত শিলা

আগ্নেয় ও পাললিক শিলা ভূ-অভ্যন্তরের প্রচণ্ড চাপ, তাপ, নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে তার পুরোনো ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম হারিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম বিশিষ্ট শিলায় পরিণত হয়। একেই বলে রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rock)। অনেকভাবেই শিলার রূপান্তর হতে পারে। যথা— (১) অত্যধিক তাপে (পিট কয়লা থেকে গ্রাফাইট), (২) প্রচণ্ড চাপে (শেল থেকে স্লেট), (৩) রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে (অ্যান্ডালুসাইট থেকে সিলিমেনাইট)।

প্রধানত চাপের ফলে বিশাল অঞ্চল জুড়ে শিলার আঞ্চলিক বা ব্যাপক রূপান্তর ঘটে। যেমন- স্লেট। স্পর্শ বা তাপের ফলে শিলার স্পর্শ বা স্থানীয় রূপান্তর হয়ে থাকে। যেমন— মার্বেল।

কয়েকটি শিলার রূপান্তরিত রূপ

গ্রানাইট

নিস

ব্যাসল্ট

অ্যাম্ফিবোলাইট

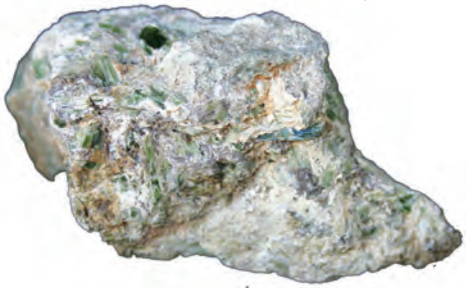

বেলেপাথর

কোয়ার্টজাইট

চুনাপাথর

মার্বেল

পিট কয়লা

গ্রাফাইট

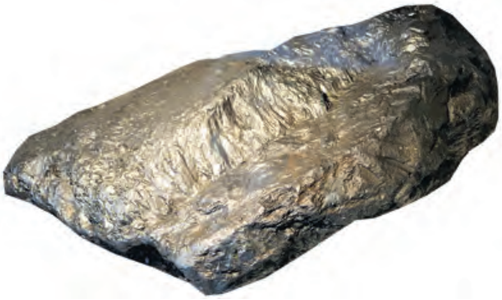

শেল

স্লেট

ফিলাইট

শিস্ট

রূপান্তরিত শিলার বিশেষত্ব

- রূপান্তরের ফলে আগ্নেয় বা পাললিক শিলা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায়।
- এই শিলা কেলাসযুক্ত হতে পারে।
- আগ্নেয় শিলা রূপান্তরিত হলে তা আগের তুলনায় আরও মসৃণ, চকচকে ও কেলাসিত হয়ে যায়।
- পাললিক শিলা রূপান্তরিত হলে তার ভঙ্গুরতা কমে যায়।
- রূপান্তরের ফলে শিলার ভেতরের খনিজের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। তখন একই ধর্মবিশিষ্ট খনিজ শিলার একদিকে কাছাকাছি চলে আসে।
- প্রচণ্ড তাপ ও চাপে রূপান্তরের সময় পাললিক শিলা মধ্যস্থ জীবাশ্মগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

- পাললিক শিলায় কেলাস গঠন হয় না কেন?

- আগ্নেয় শিলাতে জীবাশ্ম দেখা যায় না কেন?
- কোন ধরনের শিলা থেকে খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করতে সুবিধা হয় এবং কেন?

তিনটি রূপান্তরিত শিলার পরিচয়

মার্বেল : চুনাপাথরের রূপান্তরিত রূপ। মার্বেল পাথর দেখতে খুবই সুন্দর, মসৃণ ও চকচকে। এর রং সাদা, সবুজ, ধূসর, হলুদ, নীল অনেক রকমের হয়। মার্বেলকে খুব সুন্দর ভাবে নির্দিষ্ট আকারে কেটে নেওয়া যায়। তাই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে এই শিলার প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। তবে অ্যাসিডে মার্বেল দ্রুত ক্ষয়ে যায়। তাই অ্যাসিড মিশ্রিত জল মার্বেলের সংস্পর্শে আনা উচিত নয়।

স্লেট : শেলের রূপান্তরিত রূপ। স্লেট বেশ মসৃণ, নীলচে-ধূসর থেকে কালো রঙের হয়ে থাকে।

পাতলা পাতের আকারে স্লেট সহজেই ভেঙে যায়। এই ধর্মের জন্য স্লেট দিয়ে ঘরের টালি তৈরি করা হয়। এছাড়া ব্ল্যাকবোর্ড তৈরিতে এবং লেখার কাজে স্লেট ব্যবহার করা হয়।

নিস : গ্রানাইটের রূপান্তরিত রূপ। নিস শক্ত, ক্ষয় প্রতিরোধী শিলা। এতে অনেক সময় বলয়ের আকারে খনিজগুলো একসাথে থাকে। এই ধরনের নিসকে ব্যান্ডেড নিস বলা হয়। এর থেকে নির্দিষ্ট খনিজ সংগ্রহ করতে সুবিধা হয়। রাস্তাঘাট ও নির্মাণকার্যে এই শিলার প্রচুর ব্যবহার হয়ে থাকে।

শিলাচক্র

অগ্ন্যুদ্‌গমের মাধ্যমে বা ভূপৃষ্ঠের কোনো দুর্বল ছিদ্রপথে ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠে লাভারূপে বেরিয়ে এসে অথবা ভূ-অভ্যন্তরে

শীতল ও কঠিন হয়ে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি করে। পরে এই শিলা নদী, বায়ু, হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত ও অপসারিত হয়ে কোনো সমুদ্র, হ্রদ বা নদীর তলদেশে বহু বছর ধরে সঞ্চিত ও কঠিন হয়ে পাললিক শিলার সৃষ্টি করে। আগ্নেয় ও পাললিক—

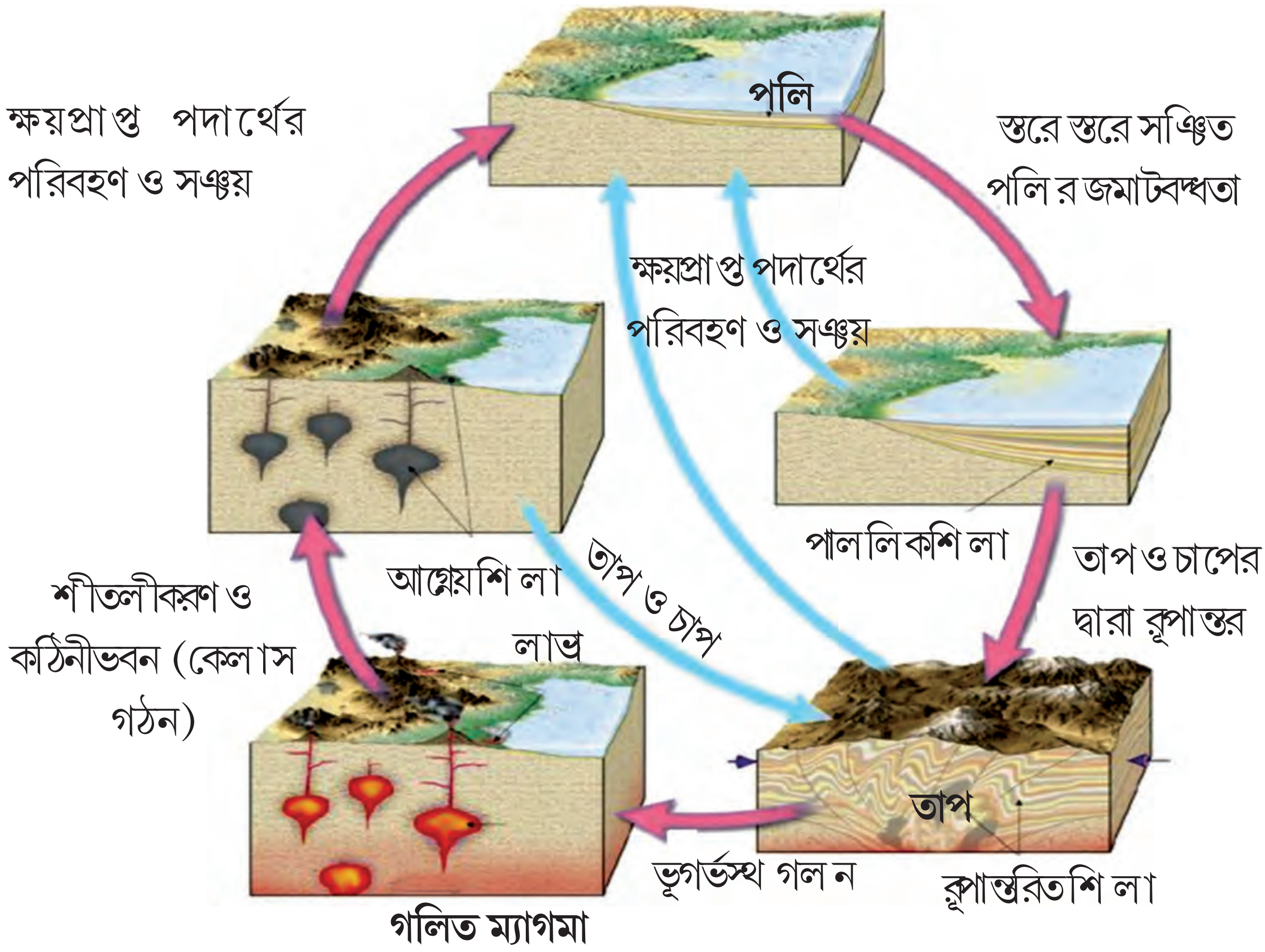

শিলাচক্র

এই দু'ধরনের শিলা ভীষণ তাপ, চাপ অথবা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয়। আবার বহু বছর পর এই তিন ধরনের শিলা ভূআলোড়নের ফলে ভূগর্ভে প্রবেশ করলে ম্যাগমায় পরিণত হয়। এই ম্যাগমা থেকে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হয়। আবার কখনো রূপান্তরিত শিলা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত ও অপসারিত হয়ে নদী, সমুদ্র বা হ্রদের তলদেশে সঞ্চিত হয়ে ও জমাট বেঁধে পাললিক শিলা তৈরি করে। প্রকৃতিতে শিলার উৎপত্তি ও এক শিলা থেকে অন্য শিলায় রূপান্তর একটি নির্দিষ্ট নিয়মে চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে চলেছে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে তিন প্রকার শিলার বিভিন্ন পদ্ধতিতে চক্রাকারে আবর্তনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি হলো শিলাচক্র।

ভূমিরূপের ওপর শিলার প্রভাব

অরিজিৎ তার মামার বাড়ি রাঁচিতে বেড়াতে গিয়েছিল।

ওখান থেকে বেতলা আর নেতারহাটেও ঘুরতে যায়। এই পুরো অঞ্চলটাতে অরিজিৎ একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে। যেমন- বিভিন্ন ধরনের ছোটো ছোটো গোলাকার টিলা। রাঁচিসহ সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চল

গ্রানাইট শিলায় গঠিত ভূমিরূপ

প্রধানত গ্রানাইট শিলায় গঠিত। এই প্রাচীন শিলা গঠিত ভূমিরূপ সাধারণত গোলাকার হয়।

ফারহা গিয়েছিল মহারাষ্ট্রের পঞ্চগণি-মহাবালেশ্বর অঞ্চলে। সেখানে চ্যাপ্টা মাথা বিশিষ্ট টেবিলের মতো ভূমিরূপ দেখতে পায়। এই জায়গাটা দাক্ষিণাত্য মালভূমির ডেকানট্র্যাপ-এর অংশ। এই অঞ্চল ব্যাসল্ট জাতীয় ক্ষারকীয় শিলায় গঠিত হওয়ায় এখানকার ভূমিরূপগুলো অনেকটা চ্যাপ্টা আকারের।

ডেকানট্র্যাপ

ইমরান চেরাপুঞ্জী- মৌসিনরামে ঘুরতে গিয়ে চুনাপাথরের গুহা দেখতে পায়। গুহার ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা চুনাপাথরের দন্ডকে বলে স্ট্যালাকটাইট। গুহার মেঝে

স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইট

থেকে ওপরের দিকে জমে থাকা চুনাপাথরের দন্ডকে বলে স্ট্যালাগমাইট। এই স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইট জুড়ে গিয়ে চুনাপাথরের স্তম্ভ তৈরি করে। আবার চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চলে নদী বা বৃষ্টির জল মাটিকে দ্রুত ক্ষয় করে ভূগর্ভে গিয়ে ছোটো বড়ো নানা আকৃতির গর্তের সৃষ্টি করে। এই ধরনের ভূমিরূপের নাম **কার্স্ট ভূমিরূপ**।

কয়েকটি শিলার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

শিলার নাম	শিলার প্রকৃতি	শিলাগঠিত অঞ্চলের ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য	রূপান্তরিত রূপ
গ্রানাইট	আগ্নেয়	গোলাকার	নিস
ব্যাসল্ট	আগ্নেয়	চ্যাপটা	অ্যাম্ফিবোলাইট
চুনাপাথর	পাললিক	গুহা	মার্বেল
বেলেপাথর	পাললিক	খাড়া ঢালবিশিষ্ট	কোয়ার্টজাইট

বিশেষ কথা

চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চলে কোনো বাঁধ বা জলাধার, বহুতল বাড়ি, অতিরিক্ত রাস্তাঘাট নির্মাণ করা উচিত নয়। কারণ নদী বা বৃষ্টির জলের সংস্পর্শে চুনাপাথর দ্রবীভূত হয়ে ক্ষয়ে গিয়ে এগুলো ভেঙে যেতে পারে। এই ধরনের নির্মাণ কার্যের জন্য আগ্নেয় শিলা অধ্যুষিত অঞ্চলই উপযুক্ত।

জানার চেষ্টা করো

- কোনো জায়গায় বেড়াতে গেলে সেখান থেকে কিছু ছোটো বড়ো পাথর খুঁজে নিয়ে এসো। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পাথরগুলো চিনে নিতে চেষ্টা করো, প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্য নাও।
- তোমার চারপাশে কোনো বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান বা স্থাপত্যকার্য থাকলে তা কোন কোন শিলায় তৈরি জানার চেষ্টা করো।
- রেললাইনের মাঝে থাকা শিলার নাম কী? কেন এই ধরনের শিলা এখানে রাখা হয়?
- গ্রানাইট শিলা চিকচিক করে কেন?
- তোমার কাছে কোনো শিলা বা খনিজ থাকলে একটু উত্তপ্ত করে দেখো— কোন শিলা তাড়াতাড়ি গরম হয় আর কোন শিলা বেশিক্ষণ গরম থাকে?

● পেনসিলের সিস কোন শিলা দিয়ে তৈরি এবং এই শিলা কী ধরনের?

শিলা গঠনকারী খনিজ :

শিলা মধ্যস্থ কেলাসিত, নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংযুক্তি বিশিষ্ট, নির্দিষ্ট পারমাণবিক গঠনযুক্ত মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ হলো খনিজ। এর নিজস্ব আকার, বর্ণ, কাঠিন্য, গঠন দেখা যায়। খনিজ একটি নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থ হতে পারে। যেমন-হিরে, যা হলো কার্বনের রূপভেদ। আবার খনিজ অনেক মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত কোনো যৌগিক পদার্থও হতে পারে। যেমন-গোলাপি রঙের অর্থোক্লেজ ফেল্ডসপার— পটাশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন আর অক্সিজেন দিয়ে গঠিত। প্রকৃতির বেশির ভাগ শিলা গঠনকারী খনিজ সিলিকন, অক্সিজেন, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম, সোডিয়াম আর পটাশিয়াম — এই আটটা মৌল দিয়ে গঠিত।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

কোয়ার্টজ : খুব কঠিন, মূলত সাদা, ষড়ভুজাকৃতি কেলাসাকার। গ্রানাইট ও ব্যাসল্ট শিলার মূল উপাদান। কোয়ার্টজ থাকায় এই শিলাগুলো বেশি ক্ষয় প্রতিরোধী। গয়না তৈরি, কাঁচ আর পাথর কাটতে কোয়ার্টজ ব্যবহৃত হয়।

ফেল্ডসপার : সাদা বা গোলাপি রঙের ফেল্ডসপার গ্রানাইট ও ব্যাসল্টের অন্যতম প্রধান উপাদান। সাদা রঙের প্ল্যাজিওক্লেজ ফেল্ডসপারের মূল রাসায়নিক উপাদান সোডিয়াম। আবার গোলাপি অর্থোক্লেজ ফেল্ডসপারের মূল উপাদান হলো পটাশিয়াম। সেরামিক শিল্পে ও কাঁচ তৈরিতে ফেল্ডসপার ব্যবহৃত হয়।

অভ্র : চকচকে, মসৃণ, পাতলা ও ভঙ্গুর প্রকৃতির। অভ্র সাদাটে স্বচ্ছ মাসকোভাইট অথবা কালো রঙের বায়োটাইট জাতীয় হতে পারে। এর উপস্থিতিতে গ্রানাইট চিকচিক করে। অভ্র তাপ ও বিদ্যুতের কুপরিবাহী। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, প্রতিমার সাজ, রঙ তৈরিতে অভ্র ব্যবহৃত হয়।

জিপসাম : বেশ নরম, হালকা, হলুদ রঙের খনিজ। জিপসাম ক্যালশিয়াম সালফেটের জলযুক্ত কেলাস। সিমেন্ট শিল্পে, সার তৈরি ও নির্মাণ কার্যে জিপসাম ব্যবহৃত হয়।

জানার বিষয়

খনিজের কাঠিন্য পরিমাপের স্কেল হলো **মোহ (Mohs) স্কেল** যার সূচক মাত্রা ১ - ১০। এই স্কেল অনুসারে সর্বনিম্ন কাঠিন্যের খনিজ হল ট্যাল্ক (১) এবং সর্বোচ্চ কাঠিন্যের খনিজ হলো হীরে (১০)।

- আমি দেখতে চকচকে, সাদা বা কালো রঙের। আমি নরম, সহজেই পাতের মতো বেঁকে যাই। গ্রানাইট শিলার একটি মূল খনিজ উপাদান আমি। বলতে পারো আমি কে?

খনিজের প্রভাব

প্রকৃতিতে খনিজের প্রভাব খুব স্পষ্ট। লোহা অথবা বক্সাইট সমৃদ্ধ ভূমির উপরিস্তর বেশ শক্ত ও লাল রঙের হয়। আবার জিপসামযুক্ত ভূমি নরম, হালকা হলুদ রঙের হয়। নরম ক্যালসাইট খনিজ থাকলে তা চুনাপাথরের সৃষ্টি করে এবং যথেষ্ট ক্ষয়প্রবণ হয়। খনিজ তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস যেখানে পাওয়া যায় সেই অঞ্চল যথেষ্ট নরম, সছিদ্র ও প্রবেশ্য পাললিক শিলার দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে। অতিরিক্ত খনিজযুক্ত মাটির (যেমন—লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডযুক্ত

ল্যাটেরাইট মাটি ও লাল মাটি) উর্বরতা কম, ফলে চাষবাস ভালো হয় না। ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ যেমন—লোহা, তামা, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট, মাইকা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলে একে ভারতের খনিজ ভাণ্ডার বলে। ছোটনাগপুর মালভূমির মানুষের প্রধান জীবিকা হলো খনিজ সম্পদ উত্তোলন এবং খনিভিত্তিক শিল্প।

- ছোটনাগপুর মালভূমি ছাড়া ভারতের আরেকটি মালভূমির নাম করো যা বিশেষ ভাবে খনিজ সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধ।

শিলা থেকে মাটির সৃষ্টি—

আদিশিলার ওপর শিলাচূর্ণ ও জৈবপদার্থের মিশ্রিত পাতলা আবরণ হলো মাটি, জীবকূলের আবাসস্থল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি যেমন- নদী, বায়ু, বৃষ্টিপাত,